হারানো জীপের রহস্য

বিমল কর

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড। কলিকাতা ৯

১

একটা ওষুধ কিনতে এসে এমন ফ্যাসাদে পড়ব ভাবিনি। আজকাল বড়-বড় ডাক্তারবাবুরা কী যে সব ওষুধ লিখে দেন, সাত দোকান ঘুরেও পাওয়া যায় না। আমার নিজের ধারণা, ডাক্তাররা যত বড় হন, তাঁদের হাতের লেখাও তত উদ্ভট হয়ে যায়, যার ফলে বেশির ভাগ দোকানেই এমন কেউ থাকে না, যে ঠিক মতন ওষুধের নামটা পড়তে পারে। আর নতুন কোনো ওষুধ হলে তো নয়ই।

ওষুধটা আমার বড়মামার। মামার বয়েস সত্তরের কাছাকাছি। হঠাৎ একটা বাড়াবাড়ি অসুখে পড়েছিলেন মামা। আমরা দুশ্চিন্তায়
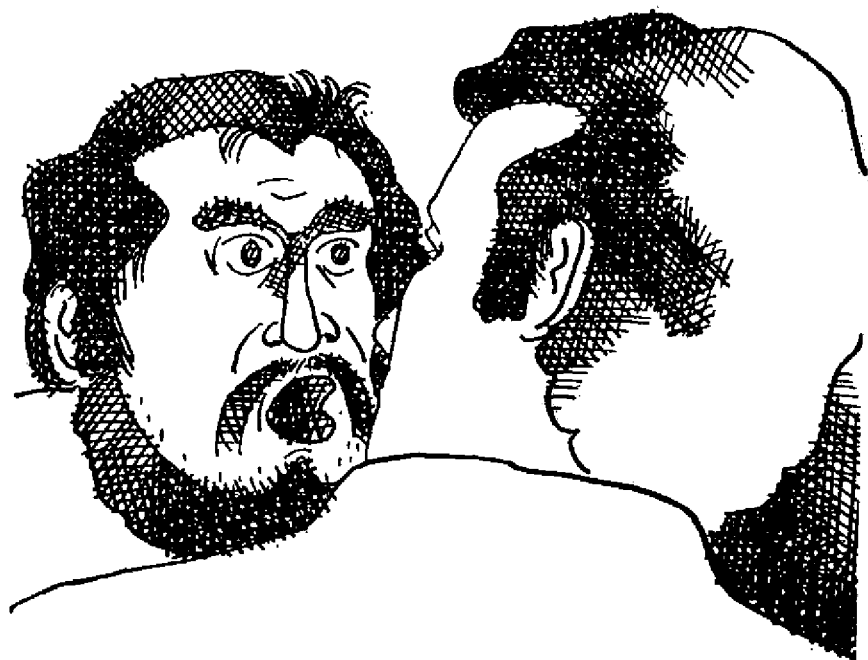
পড়েছিলাম। দিন সাতেক লড়ালড়ি করে মামা ধাক্কাটা সামলে নিলেন। কিন্তু এখনও তিনি শয্যাশায়ী। আমরা, আত্মীয়স্বজনরা রোজই কেউ-না-কেউ তাঁর খোঁজ-খবর নিতে যাই।

আজ আমি গিয়েছিলাম। শনিবার, আমার আধবেলা অফিস। অফিস থেকে বেরিয়ে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্পগুজব করে চা-টা খেয়ে গিয়েছিলাম মামার বাড়ি টালিগঞ্জ।

মামা ভালই ছিলেন। বাড়িতে আরও অনেকে এসেছিল। কথাবার্তায়, গল্পে সন্ধে হয়ে গেল। কলকাতায় শীত পড়েছে। বাড়ি ফেরার জন্যে উঠছি, মামীমা হঠাৎ আমায় বললেন, "তুই তো বাড়ি যাবি, জগু। এই ওষুধটা এনে দিয়ে যা।"

একটা ওষুধ আনা এমন কী হাতি-ঘোড়ার ব্যাপার। যাব আর আসব। বললাম, "প্রেসক্রিপশান দাও।"

মামাদের পাড়ায় ওষুধের দোকান রয়েছে গোটা তিনেক। যেতে-আসতে চোখে পড়ে দোকানগুলো। যে-কোনো একটা থেকে ওষুধটা কিনে আনব।

প্রেসক্রিপশান পকেটে করে বেরিয়ে পড়লাম। দেওয়াল-ঘড়িতে তখন শব্দ করে সাতটা বাজছে। কানে শব্দ শুনতে-শুনতে বেরিয়ে পড়লাম।

প্রথম দোকানে ওষুধটা পেলাম না। দ্বিতীয় দোকানে বলল, ওষুধের নাম বুঝতে পারছে না। তৃতীয় দোকান স্পষ্টই বলে দিল, এ-সব বিদেশী ওষুধ তারা রাখে না।

কাছাকাছি আরও ক'টা দোকান ঘুরে আমার মনে হল, এদিকে এই ওষুধ পাওয়া যাবে না। ভাবলাম ট্রামে করে রাসবিহারীতে যাই, পেয়ে যাব। তাতে খানিকটা সময় যাবে ঠিকই, কিন্তু মামার ওষুধটা না এনে দিয়ে যাই-ই বা কী করে?

ট্রামে উঠে জায়গা পেলাম। একেবারে সামনের দিকে। জানলার দিকে কে যে বসেছিল, আমি লক্ষ করিনি। পাশে গিয়ে বসলাম।

ট্রামের জানলা খোলা। বাইরে কলকাতার শীতের সেই ধোঁয়াশা। তেমন কিছু শীত নয়, তবু ঠাণ্ডাটা বোঝা যাচ্ছে। মনে-মনে আমি খানিকটা ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। ওষুধ কিনে আবার ফিরতে হবে, তারপর বাড়ি যাওয়া। সেও কম দূর নয়; আমরা থাকি মানিকতলায়, সুকিয়া স্ট্রীটে।

আমি খানিকটা অন্যমনস্ক ছিলাম।

হঠাৎ কাঁধে কার হাত পড়ায় মুখ ফেরালাম। পাশের লোকটি আমার কাঁধ ধরে নাড়ছে ধীরে ধীরে।

"জগদীশ না?"

আমি তাকিয়ে থাকলাম। দেখছিলাম লোকটিকে। চৌকো মুখ, গালে দাড়ি, একমাথা উসকো-খুসকো চুল, গায়ে কালো পুলওভার। বেশ শক্তসমর্থ চেহারা।

আমি তাকিয়ে রয়েছি দেখে লোকটি চোখ কুঁচকে আবার বলল, "জগদীশ না?"

সামান্য মাথা হেলিয়ে বললাম, "হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?"

"আমায় চিনতে পারছিস না? সুবীর, সুবীরদা…।"

সুবীরদা? চোখের পাতা পড়ছিল না আমার, তাকিয়ে থাকলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না। অথচ গভীর করে লক্ষ করলে ওই দাড়িগোঁফের জঙ্গল থেকে সুবীরদার মুখের আদলটা ধরা দেয়। অন্তত চোখ দুটো। আগের মতন অত উজ্জ্বল নয়, বরং সামান্য ঘোলাটে দেখাচ্ছে, কিন্তু

সেই পুরনো চোখ—বড় বড়, জোড়া ভুরু।

আমি সুবীরদাকে চিনতে পারছি না দেখে সুবীরদাও যেন সামান্য অবাক হয়ে আমায় দেখছিল।

"সুবীরদা, তুমি?"

"চিনতে পারলি?"

"তোমায় কিন্তু চেনা যায় না।"

সুবীরদার চোখে হাসির ঝলক উঠল। "তুই এদিকে কোথায়?"

বড়মামার ওষুধের কথা বললাম।

"রাসবিহারীতে নামবি তাহলে?"

"হ্যাঁ। ওষুধটা কিনে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।"

"ঠিক আছে; চল, আমিও নামি।"

রাসবিহারীর মোড় আসতে আরও গোটা দুয়েক স্টপ ছিল। হঠাৎ আমার খেয়াল হল, কার মুখে যেন শুনেছিলাম, সুবীরদার কী একটা হয়েছিল—অ্যাকসিডেন্ট গোছের। খেয়াল হতে জিজ্ঞেস করলাম, "তোমার নাকি সিরিয়াস অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল?"

সুবীরদা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত; তারপর বলল, "কার কাছে শুনেছিলি?"

"তা বলতে পারব না। শুনেছিলাম।"

একটু চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, "অ্যাকসিডেন্ট বলতে পারিস। তবে ঠিক-ঠিক বললে অ্যাকসিডেন্ট বলা যায় না।" বলে সুবীরদা চুপ করে গেল।

রাসবিহারীর মোড়ে ট্রাম থামতে আমরা নেমে পড়লাম।

"তোমার সঙ্গে কতদিন পরে দেখা হল সুবীরদা? বছরখানেক?"

"তা হবে।"

"তুমি কি কলকাতায় থাকো না?"

"থাকি; তবে আজকাল কমই থাকছি।"

"কোথায় থাকো?"

"ঠিক নেই; কখনো গিধনি, কখনো ঘাটশিলা।"

সামান্য এগিয়ে একটা ওষুধের দোকান পাওয়া গেল।

সুবীরদা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকল। আমি সামান্য ভয়ে-ভয়ে দোকানে ঢুকলাম, কী জানি, ওষুধটা পাব কি পাব না!

কপাল ভাল। ওষুধটা পাওয়া গেল। আসলে ওষুধটা নতুন নয়, পুরনো, তবে হালে ওষুধটা আর পুরনো নামে বাজারে চলছে না, নতুন নাম হয়েছে।

সুবীরদা নীচে দাঁড়িয়ে ছিল। বলল, "তুই আবার টালিগঞ্জ ফিরবি, আবার আসবি। শোন্, একটা ট্যাক্সি ধর। টালিগঞ্জ চল। আবার ফিরে আসব। আমি একবার বউবাজার যাব, আমার সঙ্গে তুই আরামে বউবাজার পর্যন্ত যেতে পারবি।"

"ট্যাক্সি? আরে সাবাস, সে তো অনেক টাকা পড়ে যাবে।"

"তোকে টাকার চিন্তা করতে হবে না। ট্যাক্সি ধর্। তোর সঙ্গে কথা আছে।"

ট্রামে আসা-যাওয়ার চেয়ে ট্যাক্সি চড়া নিশ্চয় আরামের ব্যাপার। সময়ও বাঁচবে অনেকটা। সুবীরদার সঙ্গে গল্প করা যাবে। খুশিই হলাম।

কলকাতা শহরে ট্যাক্সি ধরা কঠিন। কিন্তু কোনো ট্যাক্সিঅলা যদি শোনে খাস কলকাতার মধ্যে লম্বা পাড়ি দেওয়া যাবে—সঙ্গে সঙ্গে বিগলিত হয়ে পড়ে।

ট্যাক্সিতে বসে সুবীরদা বলল, "তোকে একটা অদ্ভুত কথা বলব।

বিশ্বাস করতে পারবি না। করা মুশকিল, আমারই মাঝে-মাঝে মনে হয়, আমি ভুল দেখছি, ভুল ভাবছি, হয়ত আমি বেঁচে নেই. কিংবা বেঁচে থাকলেও কেমন করে বেঁচে আছি—আমি জানি না, বুঝতে পারি না।”

আমি অবাক হয়ে সুবীরদার মুখের দিকে তাকালাম। সুবীরদার গলার স্বর অন্যরকম শোনাচ্ছিল : চাপা, গম্ভীর, বিষণ্ণ।

“তুমি বেঁচে নেই মানে? দিব্যি বেঁচে আছ। আমার পাশে বসে রয়েছ।” আমি ঠাট্টা করে বললাম।

অল্প সময় চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, “তুই যে অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেছিলি সেটা আসলে কী জানিস?”

“কী?”

“আমরা চারজনে হারিয়ে গিয়েছিলাম। কেমন করে, কোথায় আমি জানি না। তিন দিন পরে আমি ফিরে আসি। কেমন করে তাও বলতে পারব না। দিন দশ পরে অনিলও ফিরে আসে, কিন্তু এমনই কপাল, আমি তাকে ধরতে যাবার আগেই সে চলন্ত ট্রেনের তলায় লাফ দিয়ে পড়ে। তার আর কিছু ছিল না। এখনও দু জন মিসিং। মৃগাঙ্ক আর আমাদের ড্রাইভার কপিল।”

সুবীরদার কথা আমার মাথায় কিছুই ঢুকল না। হারিয়ে যাওয়া বলতে কী বোঝাতে চাইছে সুবীরদা? মানুষ আবার হারায় কেমন করে? কাচ্চাবাচ্চারা ভিড়ে-ভাড়াক্কায় হারায়, সুবীরদারা কেন হারাবে? কোথায় হারাবে? মাথাটাথা খারাপ হয়ে গেছে নাকি সুবীরদার? কথাটা আমি তেমন করে কানে তুললাম না। অবিশ্বাসের গলায় বললাম, “তোমার কি মাথার গোলমাল হয়েছে?”

সুবীরদা আমার দিকেই তাকিয়ে ছিল। ট্যাক্সির অন্ধকারেও চোখ যেন কেমন চকচক করছে। আমার কাঁধের কাছটায় প্রায় খামচে ধরল সুবীরদা। বলল, “হতেও পারে মাথার গোলমাল। জানি না। আমি তো আগেই বললাম, আমি যে বেঁচে আছি—এটাই ভাবতে আমার কেমন যেন লাগে, বিশ্বাস হয় না।”

সুবীরদাকে আমি অনেকদিন ধরে জানি। এক সময়ে আমাদের পাড়াতেই থাকত। আমার মেজমাসির শ্বশুরবাড়ির সম্পর্কে কেমন এক আত্মীয়। সুবীরদা আমার চেয়ে বছর পাঁচেকের বড়। তবু একটা বন্ধু-বন্ধু সম্পর্ক ছিল একসময়। তারপর আজকাল চোখের আড়ালে পড়ে গেলে মানুষ যেমন দূরের মানুষ হয়ে যায়, সুবীরদারও সেইরকম হয়েছিল। হঠাৎ-হঠাৎ রাস্তাঘাটে সিনেমা হাউসে দেখা হলে গল্পগুজব হত। অবশ্য এর-ওর মারফত খবরাখবর রাখার চেষ্টা করেছি সুবীরদার। আমি শুনেছিলাম, সুবীরদার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল।

ট্যাক্সি আনোয়ার শা রোডের কাছাকাছি পৌঁছে গেল। আর খানিকটা পরেই মামার বাড়ি। ট্যাক্সি থেকে নেমে আমি শুধু ওষুধটা দিয়ে দেব, সুবীরদা বসেই থাকবে, ফিরে এসে আবার আমি ট্যাক্সিতে বসব। তারপর দুজনেই ফিরব বউবাজার পর্যন্ত।

সুবীরদা বলল, “তুই আমার কথা বিশ্বাস করতে পারবি না, তবু শুনবি, না শুনবি না?”

আমি যেন কী মনে করে বললাম, “শুনব। তার আগে আমার একটা কথার জবাব দাও।”

“বল?”

“মাসিমা কোথায়?”

“কেন? বাড়িতে।”

“ভাল আছেন?”

"আছে।"

"আভাদি কোথায়?"

"তার শ্বশুরবাড়িতে, শ্রীরামপুরে।...তুই এসব কথা আমায় জিজ্ঞেস করছিস কেন! দেখতে চাইছিস—আমার মাথার ঠিক আছে কি না! আমি সুবীর কি না?"

ব্যাপারটা ঠিক তা নয়, তবু ওইরকম কিছু হতে পারে, আমি অত ভেবে দেখিনি। বললাম, "তোমার মাথার গোলমাল হয়নি। এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম।" বলে একটু হাসলাম।

সুবীরদা বলল, "তুই কোথায় যাবি ট্যাক্সিঅলাকে বলে দে।"

ট্যাক্সিঅলাকে রাস্তার ঠিকানা বলে দিলাম।

সুবীরদা বলল, "আমার মনের অবস্থা তোকে বোঝাতে পারব না। কিছুই নয়—একেবারে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার সব, হঠাৎ কী যে ঘটে গেল, কেন ঘটল, কিছুই বুঝলাম না। ছিলাম চারজন, এখন আমি মাত্র একা। অনিলকে ফিরে পেলাম, দেখলাম, কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলতে যাবার আগেই সে রেল-লাইনের ওপরে লাফিয়ে পড়ল। আমায় দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিল কি না বুঝতে পারলাম না।"

"কোন্ অনিল?"

"আমার বন্ধু। ব্যবসার পার্টনার।"

"দেখেছি। একটু মোটামতন ফরসা রঙ। নাগপুর না রায়পুরের লোক।"

"নাগপুরের।"

"আর অন্য কার কথা বলছিলে?"

"মৃগাঙ্ক। আমার আর-এক বন্ধু। বায়োকেমিস্ট। একটা ওষুধ কোম্পানিতে চাকরি করত, ছেড়ে দিয়ে বাইরে—মানে বিদেশ যাবার চেষ্টা করছিল। একটা চান্সও পেয়েছিল। কিন্তু লোকটাই নেই।"

আমি বললাম, "কোথায় থাকতেন উনি?"

"বউবাজারে। বাড়িতে দাদা-টাদা আছে। একেবারে ক্যালাস। কোনো গা নেই।"

"তুমি কি ওই বাড়িতেই যাচ্ছ?"

"হ্যাঁ।"

"কেন?"

"খোঁজখবর করতে। আমি কলকাতায় থাকলে একবার করে গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসি। যদি ফিরে এসে থাকে।"

আমি অবাক হয়ে সুবীরদার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। আশ্চর্য মানুষ। যদি ধরে নিতে হয়—সুবীরদার কথা মতন—তার বন্ধু মৃগাঙ্ক হারিয়ে গেছে, তাহলে কেন সে এমন করে খোঁজ নিতে যায় মৃগাঙ্কর বাড়ি? আশায়। প্রত্যাশায়। সুবীরদা নিশ্চয় আশা করে তার বন্ধু মৃগাঙ্ক ফিরে আসবে।

ভেবে দেখলাম, সুবীরদার কথা মতন যদি সবই বিশ্বাস করতে হয়, তবে সে নিজে হারিয়ে গিয়ে ফিরে এসেছে, অনিলও এসেছিল; তা হলে মৃগাঙ্ক আর সেই ড্রাইভারই বা কেন আসবে না?

"তোমার ড্রাইভারও কলকাতার লোক?"

"কপিল থাকত বেহালায়। তার বাড়িতেও খোঁজ করি। সেও ফেরেনি।"

আমি বললাম, "তুমি আশা করো ওরা ফিরবে?"

"করি। আমি যদি ফিরে এসে থাকি, ওরাও আসতে পারে। তবে কেমনভাবে আসবে আমি জানি না।"

ট্যাক্সিটাকে আমি থামতে বললাম।

২

টালিগঞ্জ থেকে ট্যাক্সিটা আবার ফিরছিল।

সুবীরদা বলল, "আমার আসল কথাটা তোকে এখনও বলিনি।"

বললাম, "এবার বলো, শুনি।"

সুবীরদা কয়েক মুহূর্ত কোনো কথা বলল না, অন্যমনস্কভাবে নিজের মাথার চুল ঘাঁটল, বাইরে তাকাল, আবার আমার দিকে চোখ ফেরাল। "আমার স্বভাব তুই জানিস। হুজুগে মানুষ। পেটের ধান্ধায় খানিকটা ঘোরাঘুরি করি, আর বাকি সময়টায় খাই-

দাই, বগল বাজাই। এবারে পুজোর সময়, মানে তোর পুজো ফুরোলো দশই অক্টোবর, আর এগারোই অক্টোবর, একাদশীর দিন আমরা চারজনে—আমি, অনিল, মৃগাঙ্ক আর আমার ড্রাইভার কপিল বেরিয়ে পড়লাম।
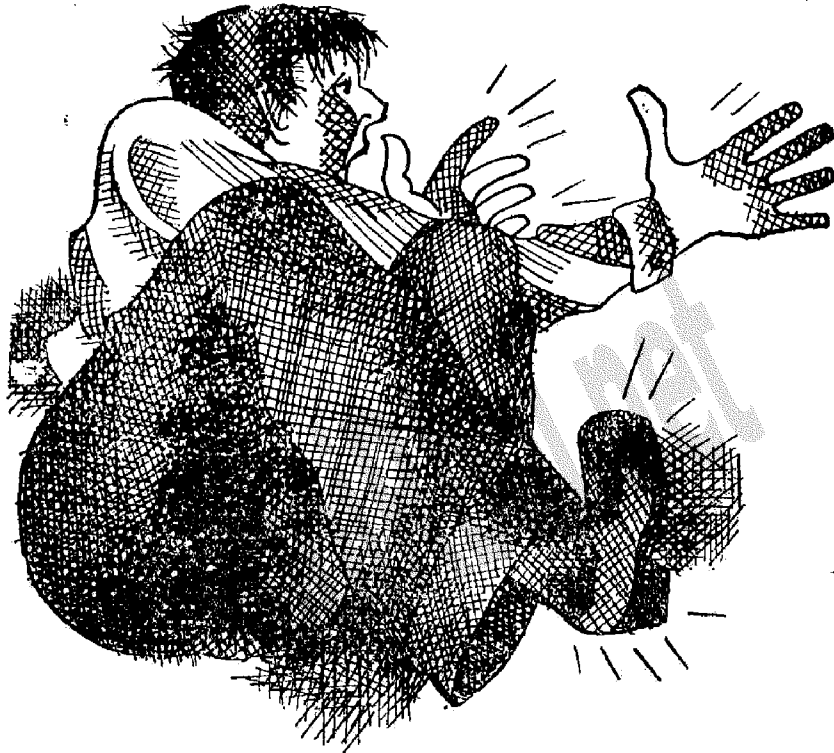
এবারে দু রকম দিন ছিল পাঁজিতে, দশমী দু মতে করেছে লোকে।

আমরা এগারোই বেরিয়েছিলাম। বুধবার। আমার বেশ মনে আছে। আমাদের ডেস্টিনেশান ছিল ঘাটশিলা। ঘাটশিলায় থাকব দিন পাঁচ সাত, একটু জঙ্গলেটঙ্গলে বেড়াব, এই ছিল মতলব। আসলে আরও একটা ব্যাপার ছিল। গিধনিতে কমলেশ্বর রায় বলে এক ভদ্রলোক একটা কোল্ড স্টোরেজ করার প্ল্যান করছিলেন। আমাদের চেনাশোনা। কাজটা আমাদের দিতে চেয়েছিলেন, মানে আমার আর অনিলের যে ফার্মটা রয়েছে সেই ফার্মকে। আমরা ভেবেছিলাম, রথ দেখা কলা বেচা দুইই হবে। গিধনিতে সাইটটা দেখে নেব, সুবিধে-অসুবিধে জেনে নেব—তারপর ঘাটশিলায় গিয়ে ছুটি কাটাবার সময় কোল্ড স্টোরেজের নকশা-ফকশার খসড়া একটা করে নেব।"

সুবীরদার কথা শুনতে-শুনতে আমার হঠাৎ কেমন যেন মনে হল, সুবীরদার গলার স্বর আগের মতন নেই। এতক্ষণ খেয়াল করিনি, কিন্তু এখন কানে স্পষ্টই ধরা পড়ছিল। ভয়, উত্তেজনা, অস্থিরতা থাকলে মানুষের গলার স্বর এই রকমই শোনায় অনেকটা। তা ছাড়া, নজরে পড়ল, হাতটাত তুললেই সুবীরদার হাত কেমন কাঁপছে। জোরে নয়, ধীরেই, তবু চোখে পড়ে। মানুষটা যে রীতিমত উদ্বিগ্ন, ভীত হয়ে রয়েছে তাতে আমার সন্দেহ হল না।

"সোজা কলকাতা থেকেই গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিলে?" আমি

কথার কথা বললাম।

"হ্যাঁ। আমার সেই জীপ। তুই তো দেখেছিস। পানাগড় থেকে কিনেছিলাম লোহার দরে, তারপর সারিয়ে-সুরিয়ে একটা বডি বানিয়ে নিয়েছিলাম, লোকে দেখলেই বুঝতে পারত জিনিস একটা। তা সেই গাড়িতেই আমরা এগারোই অক্টোবর সকালে বেরিয়ে পড়লাম। খড়্গাপুরে পৌঁছে গাড়িটা গণ্ডগোল করল। ব্রেকের গণ্ডগোল। সারিয়ে-সুরিয়ে শহরে খাওয়ার পাট চুকোলাম, তারপর আবার বেরিয়ে পড়লাম ঝাড়গ্রামের দিকে। ঝাড়গ্রামে অনিলের এক আত্মীয় থাকে—বলল, যাবার সময় দেখা করে যাবে, চা-টা খেয়ে নেবে।"

"ঝাড়গ্রাম তো কাছেই।"

"কলকাতা থেকে শ' খানেক মাইল।"

"গিয়েছি একবার। বাদলদের বাড়ি।"

"ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত বিশেষ কোনো অসুবিধে হয়নি। কিন্তু খড়্গাপুর থেকেই আকাশটা কেমন মেঘ-মেঘ করছিল। কেউ কেউ বলছিল, দিঘার দিকে আগের দিন থেকেই ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। তা ঝাড়গ্রামে পৌঁছে আমরা দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টি পেলাম। ঝড়ের মতনও লাগল। তখন বিকেল। অনিলের সেই আত্মীয়ের বাড়ি যাওয়া হল। কেউ নেই। বাড়ি ফাঁকা।" সুবীরদা থামল, যেন সেদিনের বিকেলের ছবিটা তার চোখের সামনে রয়েছে, মনে-মনে দেখছিল।

ট্যাক্সিটাও দাঁড়িয়ে পড়েছিল মোড়ের মাথায়। আবার চলতে শুরু করল সামান্য পরেই।

সুবীরদা পকেট হাতড়ে সিগারেটের প্যাকেট বার করল, লাইটার। এগিয়ে দিল। "খাবি?"

"না, তুমি খাও।"

একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল সুবীরদা। বার কয়েক ধোঁয়া গিলল, তারপর বলল, "আমাদের একটা ভুল হয়েছিল। সেদিন ওই অবস্থায় গিধনিতে না দাঁড়ালেই হত। গিধনিতে পৌঁছে এমন এক ঝড়বৃষ্টির পাল্লায় পড়লাম—কী বলব তোকে। যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি। আর জায়গাটাও একেবার ফাঁকা। ঘরবাড়ি কম। স্টেশনে ইলেকট্রিক বাতি আছে, বাদবাকি কোথাও আলোফালো নেই, মানে ইলেকট্রিসিটি নেই। অবশ্য কমলেশ্বরবাবু আমাদের বলেই দিয়েছিলেন, তিনি কোল্ড স্টোরেজ করলে তাঁকে মাইল দুই দূর থেকে ইলেকট্রিসিটি নিতে হবে। তা গিধনিতে পৌঁছে আমাদের এমন অবস্থা হল যে, সন্ধের আগে আর বেরুতে পারলাম না। ও রকম ঝড়বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানোই মুশকিল।"

আমি বললাম, "রাস্তা কেমন?"

"রাস্তা খারাপ নয়। কিন্তু তুমুল বৃষ্টির মধ্যে গাড়ি চালানো উচিত নয়। অ্যাকসিডেন্টের চান্স থাকে। তাছাড়া ভিজে রাস্তায় স্কিড করে যেতে পারে। আমাদের গাড়ির ব্রেকের গণ্ডগোল ঘটেছে আগেই। আমি কোনো রিস্‌ক্ নিলাম না। বৃষ্টি কমল, ঝড় প্রায় থেমে এল—সন্ধের মুখে-মুখে গিধনি ছাড়লাম। দুশ্চিন্তার কোনো কারণ ছিল না। ঘাটশিলা কাছেই, ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে গেলেও বেশিক্ষণ লাগবে না।"

ট্যাক্সিটা ভবানীপুর এসে পড়েছিল। বোধহয় সিনেমা ভেঙেছে, পূর্ণ সিনেমার ভিড় দেখলাম। কাছাকাছি কোথাও বিয়েবাড়ি। সানাই বাজছিল।

সুবীরদা বলল, "গিধনি থেকে বেরুবার খানিকটা পরেই দেখলাম,

মেঘ কেটে যাচ্ছে, মাঝে-মাঝেই পাতলা ঘোলাটে চাঁদের আলো উঁকি দিচ্ছিল। আবার অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল। ঝড় থামলেও বাতাস ছিল, বেশ জোর। আমরা পুরনো রাস্তা ধরেই যাচ্ছিলাম। বম্বে রোড ধরতে হলে উজিয়ে যেতে হবে অনেকটা। কপিল গাড়ি চালাচ্ছিল, আমি তার পাশে। পেছনে অনিল আর মৃগাঙ্ক। আমরা কথাবার্তা বলছিলাম, গল্প করছিলাম। ঘাটশিলায় আমাদের বাড়ি ঠিক করা ছিল। স্টেশনের কাছেই। সত্যি বলতে কী, কলকাতা থেকে বেরুবার পর রাস্তার মধ্যে যদিও বার দুই ফেঁসে গিয়েছি, তবু আমরা তেমন একটা বিরক্ত হইনি, আমাদের তাড়াহুড়োও ছিল না। যাক না সারাটা দিন—এমন কী ক্ষতি হয়েছে!... তখন অবশ্য জানতাম না, আমাদের ভাগ্যে কী অপেক্ষা করছে।" সুবীরদা আবার চুপ করে গেল। ফেলে দিল সিগারেটটা। মাথার চুল ঘাঁটল। কেমন যেন অস্থির।

নিজেই আবার বলল সুবীরদা, "ঘাটশিলায় প্রায় পৌঁছে গিয়েছি। প্রায়। নীচে নদী—একটা ছোটখাট নদী মতন। ঝরনার জল বয়ে যায়। তার ওপর লম্বা কালভার্ট। ব্রিজই বলা যায়। আমাদের গাড়িটা কালভার্টের ওপর উঠেছে—হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেল। ভাবলাম, গাড়ির আলো নিভে গেছে; ফিউজ হয়ে গিয়েছে। কিছু দেখা যাচ্ছিল না; ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। কপিলকে চিৎকার করে বললাম, গাড়ি থামাও। ব্রিজ—সামনে ব্রিজ।... আমার কথা কপিল শুনতে পেল কি না জানি না। তারপর আর আমি কিছু জানি না। কী হল, কেন হল, আমরা কে কোথায় গেলাম, গাড়ির কী হল—আমার কিছুই জানা নেই।" বলতে বলতে সুবীরদা থামল। তার গলা কাঁপছিল, ভাঙা ভাঙা স্বর। মনে হল সুবীরদা কাঁদছে।

ট্যাক্সিতে বসেও আমার বুঝতে দেরি হল না, সুবীরদার হাত থরথর করে কাঁপছে, হয়ত কপালে গলায় ঘামও জমেছে। আমার বড় অবাক লাগছিল। একটা গাড়ি রাস্তার মধ্যে খারাপ হতে পারে, তার আলোও আচমকা নিবে যেতে পারে কোনো যান্ত্রিক গোল-যোগের জন্যে, কিন্তু সুবীরদা কেন বলছে যে, তারপর কী হয়েছে, কিছুই সে জানে না?

আমি বললাম, "তোমাদের গাড়ি কি ব্রিজ থেকে নীচে পড়ে গেল?"

মাথা নাড়ল সুবীরদা। "জানি না। কিছুই জানি না।"

"তার মানে?"

"মানে কেমন করে বলব!...তিন দিন পরে আবার আমি সেই কালভার্টের ওপর নিজেকে ফিরে পেলাম।"

"কী বলছ তুমি পাগলের মতন?"

"পাগলের মতনই শোনাবে। কিন্তু কথাটা সত্যি। তিনদিন পরে আমি দেখলাম—কালভার্টের ওপর দাঁড়িয়ে আছি। আশেপাশে কেউ নেই। নীচে নদী।"

আমার বিশ্বাস হল না। এ হতে পারে না, অসম্ভব। বললাম, "তুমি কেমন করে বুঝলে তিনদিন পরে আবার তুমি ব্রিজের ওপর এসে দাঁড়িয়ে আছ?"

"বুঝিনি। প্রথমে বুঝিনি—" মাথা নাড়ল সুবীরদা। "আমি কিছুই বুঝিনি—কেমন একটা বেহুঁশ অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কোনো খেয়াল আমার ছিল না। কারও কথা আমার মনে আসেনি, অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিলের কথা একবারও মাথায় আসেনি। কেমন একটা ঘোরে ছিলাম, সম্মোহনের মধ্যে। তখন সন্ধে। একটা গাড়ি

আসছিল লাইট জ্বেলে। আমায় একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে গা
থামিয়ে তুলে নিল। ঘাটশিলায় পৌঁছনোমাত্র আমার সব মনে প
গেল। যেখানে ওঠার কথা সেখানে ছুটে গেলাম। বাড়ির মাল
বলল, কেউ আসেনি। গত তিনদিন ধরে সে আমাদের জন্য অপেক্ষ
করছে। ওই বাড়িতে গিয়েই প্রথম জানলাম, তিন-তিনটে দি
আমার কোথায় হারিয়ে গেছে। আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম
বিশ্বাস হল না। ক্যালেণ্ডার দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম লোককে
সেই দিনটা ছিল চোদ্দ তারিখ, শনিবার। তোকে আগেই বলে
আমরা বুধবার এগারো তারিখে কলকাতা ছেড়েছিলাম, আর দুটে
দিন মাঝে রেখে, শনিবার আমি নিজেকে ঘাটশিলায় দেখলাম। এ
তিনটে দিন কোথায় গেল? কোথায় গেল আমার বন্ধুরা, অনিল
মৃগাঙ্ক? কোথায় গেল কপিল, আমার ড্রাইভার ছেলেটি? গাড়িটা
বা কোথায়?" সুবীরদা দু হাতে মুখ ঢেকে ফেলল। মাথা নাড়তে
লাগল, যেন অসহ্য এক কষ্ট হচ্ছে তার।

আমার কিছু করার ছিল না। সামান্য শিউরে উঠলাম। বিশ্বাস
হচ্ছে না বিন্দুমাত্র, অথচ সুবীরদা আমার কাছে অনর্গল মিথ্যে কথ
বলছে—এটাই বা বিশ্বাস করি কেমন করে! হতে পারে, অ্যাকসি-
ডেন্টের পর সুবীরদার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। শুনেছি অনেক
সময় দুর্ঘটনায় পড়ে মাথায় চোট লেগে কিংবা আচমকা মানসিক
আঘাতে মানুষ তার পুরনো কথা সব ভুলে যায়। সুবীরদার বি
তাই হয়েছে? ভুলভাল বকে যাচ্ছে!

আমি বললাম, "তুমি বলছ, চোদ্দ তারিখে তুমি ঘাটশিলায়
গিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ; সন্ধের পর।"

"তার মানে সেদিন হয় চতুর্দশী না হয় পূর্ণিমা ছিল।"

"পূর্ণিমার মতনই ছিল—চাঁদের আলো ছিল খুব।"

"তারপর তুমি কী করলে?"

"কী করব! সেদিন আমি কিছু করতে পারলাম না। করার বুদ্ধিও মাথায় এল না। পরের দিন সকালে আমার খানিকটা চেনা-জানা এক ভদ্রলোককে ধরে চললাম সেই নদীর কাছে।"

"ভদ্রলোককে কিছু বলোনি?"

"বলেছিলাম। বিশ্বাস করেননি।" বলে সুবীরদা রুমাল বার করে কপাল গাল গলা মুছল। বলল, "আমার ভয় হচ্ছিল, গাড়িটা কালভার্টের ওপর থেকে পড়ে কিছু হয়েছে। হয়ত নদীতে অনিলদের দেখতে পাব, অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে, গাড়িটা ভেঙেচুরে তুবড়ে পড়ে রয়েছে।"

আমার কপালেও ঘাম জমছিল এবার।

"নদীতে কিছু নেই—" সুবীরদা বলল, "কালভার্টের ওপর থেকে দেখলাম, নীচে নেমে কত খোঁজাখুঁজি করলাম, কোথাও চিহ্ন নেই, অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিল কারও নয়। জীপগাড়িটাও চোখে পড়ল না।"

"আশ্চর্য তো!··· এমন তো হতে পারে—নদীতে পড়ে ভেসে গেছে?"

"সেরকম মনে হতেই পারে। কিন্তু অক্টোবরের নদী। জল কম। আর নদীতে জলের চেয়ে পাথর আর বালিই বেশি। তিনটে মানুষ আর গাড়ি সবই ভেসে যাবে—কোনো চিহ্নই থাকবে না—এ কেমন করে হয়?"

কথাটা ঠিকই। কোনো-না-কোনো চিহ্ন তো থাকা উচিত।

সুবীরদা বলল, "আমি দু-দুটো দিন লোকজন এনে তন্ন-তন্ন করে

খুঁজেছি—কিছু পাইনি। একটা রুমাল পর্যন্ত নয়, গাড়ির এক টুকরো ভাঙা লোহাও নয়। পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে গেছে সব।”

ট্যাক্সি এসপ্ল্যানেড ছাড়িয়ে গেল। তাকালাম রাস্তার দিকে। এখনও রাস্তায় ভিড়, গাড়িঘোড়া যথেষ্ট।

অন্যমনস্কভাবে আমি জিজ্ঞেস করলাম, “তুমি থানা-পুলিশ করোনি?”

সুবীরদা বলল, “করেছি। ঘাটশিলা পুলিস স্টেশনে গিয়েছিলাম। আমার কথা কানেই তুলতে চায় না, ভাবে পাগল, বদ্ধ উন্মাদ। আমি ওদের কোনো দোষ দেখি না। সমস্ত ব্যাপারটা ভেলকিবাজির মতন, ম্যাজিক। বাস্তবিকই এ-রকম হবার নয়, হয় না। গাড়ি সমেত চারটে লোক হাওয়া হয়ে গেল, আবার একে-একে দুজন ফিরে এল —একথা কে বিশ্বাস করবে! তবু জোর-জবরদস্তি করে একটা ডায়েরি লিখিয়ে রেখেছি ঘাটশিলার থানায়।”

“তোমার বন্ধু অনিলবাবু মারা যাবার আগে, না পরে?”

“আগে লিখিয়েছি; আবার পরেও অনিলের কথা জানিয়ে এসেছি।” বলে সুবীরদা একটু থামল, তারপর বলল, “ঘাটশিলা পুলিস স্টেশনের চৌধুরীজি এখন আমার খুব চেনা শোনা হয়ে গিয়েছেন। প্রথমটায় তিনি আমায় পাত্তা দিতে চাননি। ভেবেছিলেন —মাথা-পাগলা মানুষ, এখন আর অতটা ভাবেন না। তিনি নিজে লোক দিয়ে খোঁজ-খবর করিয়েছেন, কোনো লাভ হয়নি।”

আমি রাস্তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গণেশ অ্যাভিনুর মুখে লাল আলো পেয়ে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

“তুমি এখন কলকাতায় আছ? না, ঘাটশিলা ছুটছ?”

“ওদিকেই বেশি থাকি। আট-দশ দিন অন্তর কলকাতা আসি। দু একদিন এখানে থাকি, কাজকর্ম কোনো রকমে একটু সারি, আবার চলে যাই।”

ট্যাক্সিটা আবার চলতে শুরু করল।

সুবীরদা বলল, “তুই একদিন আমার বাড়ি আয়। আসবি? কালই চলে আয়। আমায় যেভাবে পারিস একটু সাহায্য কর, ভাই! অন্তত পরামর্শ দে—আমি কী করব!” বলতে বলতে সুবীরদা আমার হাত জড়িয়ে ধরল।

৩
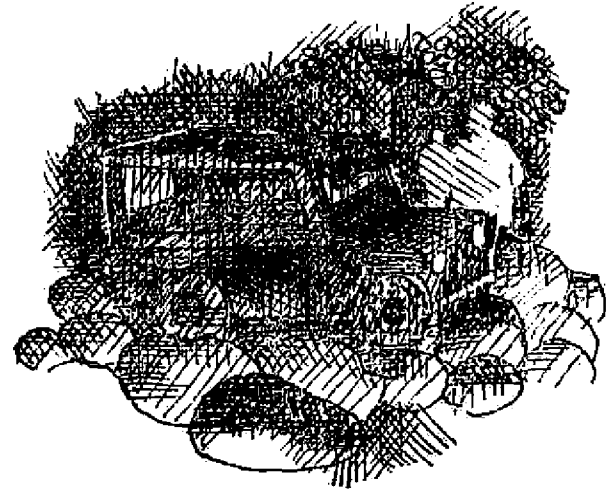
সুবীরদা আমার মাথাটাই যেন গণ্ডগোল করে দিয়েছিল। ওকে আমি ভাল করেই চিনি ; ধাপ্পা বা ধোঁকা দেবার লোক সুবীরদা নয়। অথচ ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না, কেউ করবে না। আমিও বিশ্বাস করতে রাজি নই, কিন্তু লোকটার যে-রকম অবস্থা দেখলাম তাতে তাকে এড়িয়ে যাওয়াও উচিত নয়। যদি এমনই হয়, সুবীরদার সত্যিই মাথার দোষ হয়েছে, তবে একটু ভাল করে খোঁজখবর করা দরকার বই কী! আমার খারাপ লাগছিল, কষ্টও হচ্ছিল সুবীরদার

জন্যে। রাত্রে বিছানায় শুয়ে তার কথা ভাবতে-ভাবতে ঘুম আসছিল না, মাথা গরম হয়ে যাচ্ছিল। মাঝরাতের পর ঘুমিয়ে পড়লাম।

পরের দিন সুবীরদার বাড়ি গেলাম। তার বাড়ির ঠিকানা আমার জানা ছিল, আগে বার কয়েক গিয়েছি। দেশপ্রিয় পার্কের কাছাকাছি থাকে।

সুবীরদা বাড়িতেই ছিল। আমায় দেখে খুশি হল। বলল, "তুই আসবি আমি জানতাম। আমার মন বলছিল।"

বললাম, "তোমার সঙ্গে পরে কথা হবে, আগে আমি মাসিমার সঙ্গে দেখা করে আসি। তুমি তোমার ঘরে যাও।"

সুবীরদা আমার দিকে দু-পলক তাকিয়ে থেকে ম্লান হাসল। "বুঝেছি। বেশ, তুই মায়ের সঙ্গে দেখা করে আমার ঘরে আয়।"

মাসিমা ছিলেন রান্নাঘরের দিকে। হাঁক দিতেই বেরিয়ে এলেন।

"ও মা তুই? জগু?"

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম। আদর করে কাছে টেনে নিলেন। "ধন্য ছেলে বাবা তোরা, চোখের আড়াল হলাম তো আর কোনো খোঁজ-খবর নিস না। বাড়ির খবর বল। কে কেমন আছে? তোর মা, বাবা, ছেলেমেয়েরা?"

বাড়ির খবরাখবর দিলাম। মাসিমাকে আমি খুঁটিয়ে দেখছিলাম কথা বলতে-বলতে। গোলগাল ভরাট মুখে হাসির ভাব থাকলেও কেমন শুকনো দেখাচ্ছিল। দু চোখে যেন দুশ্চিন্তা। কপাল কুঁচকে রয়েছে। মুখ খসখসে দেখাচ্ছিল।

শেষে আমি বললাম, "সুবীরদার সঙ্গে কাল হঠাৎ ট্রামে দেখা হয়েছিল।"

"বলেছে।" বলে মাসিমা গম্ভীর বিষণ্ণ হয়ে গেলেন।

সামান্য অপেক্ষা করে আমি বললাম, "সুবীরদাকে দেখে, তার কথাবার্তা শুনে আমার কেমন লাগল। ভাবনা হল। ভয়ও হল, মাসিমা। ভাবলাম আপনার সঙ্গে দেখা করলে কিছু জানতে পারব।"

আমার কথার কোনো জবাব সঙ্গে-সঙ্গে দিলেন না উনি। কিছু যেন ভাবছিলেন। কপালের ভাঁজ আরও ঘন হল। পরে বললেন, "আমার কাছে কী জানবে, বাবা। আমি নিজেই কিছু বুঝছি না।"

যা বলতে চাইছিলাম তা স্পষ্ট করে বলা যায় না। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বললাম, "না, মানে আমি বলতে চাইছি, হঠাৎ কোনো ধাক্কা খেয়ে এলোমেলো কিছু বলছে না তো সুবীরদা?···এমন তো অনেক সময় হয়, মাথায় কিছু একটা ঢুকে যায়, কিছুতেই ভুলতে পারে না।"

মাসিমা অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, "কী জানি!"

"এমনিতে আপনার কী মনে হয়? বাড়িতে যখন থাকে সুবীরদা—কোনো রকম পরিবর্তন দেখেন? মানে—মানে একটু অস্বাভাবিক···।"

"তুমি কেমন দেখছ বাবা—আজকাল এই রকমই দেখি। এমনিতে যে পালটে গেছে তা নয়, তবে ওর মনের অবস্থাটা যা, তাতে ছটফট করবে, দৌড়ে দৌড়ে বাইরে যাবে, আমি কী আর করতে পারি!"

মাসিমাকে আর ঘাঁটিয়ে লাভ নেই। বাড়িতে সুবীরদার ব্যবহার এমন কিছু নয় যা দেখে বলা যায় তার মাথা খারাপ হয়েছে। মাসিমার চেয়ে কে আর বেশি বুঝবে তাঁর ছেলেকে!

অন্য দু-চারটে কথা বললাম মাসিমার সঙ্গে, মামুলি কথা। তারপর সুবীরদার কাছে গেলাম।

সুবীরদা নিজের বসার ঘরে বসে-বসে সিগারেট খাচ্ছিল। তাকাল। "আয়, বোস।"

জানলার দিকে ছোট সোফায় আমি বসলাম।

সুবীরদা নিজেই বলল, "মায়ের সঙ্গে কথা শেষ হল?" বলে একটু হাসল, "কী বলল মা?"

কোনো জবাব দিলাম না, হাসলাম।

সুবীরদা বলল, "তোর এখনও বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা? তোর কোনো দোষ নেই জগু, আমি যাদের বলেছি কেউ বিশ্বাস করেনি।"

আমি বললাম, "তুমি কাকে কাকে বলেছ?"

"তুই চিনবি না। যাদেরই বলেছি—সবাই ভেবেছে, আমি ভুল বকছি, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।"

আমি চুপচাপ থাকলাম। ঘরটার দেখতে লাগলাম অন্যমনস্ক-ভাবে। এসেছি সকাল সকাল। দুপুরে মামার বাড়ি চলে যেতে পারি, কিংবা বাড়িতেও ফিরতে পারি, ঠিক নেই। সুবীরদার বসার ঘরটা ছোট, জিনিসপত্র কম কিন্তু এলোমেলো করে সাজানো বলে কেমন চাপ-চাপ লাগে।

"তুমি একজন বড় ডাক্তারের কাছে যেতে পারতে···" আমি বললাম।

"কেন?" সুবীরদা জিজ্ঞেস করল।

"না, আমি বলছি—মানে ভাবছিলাম," ইতস্তত করে আমি বললাম, "তুমি যা ভাবছ কিংবা বলছ—এটা সত্যি নাও হতে পারে। তোমার ধারণা ভুল।"

"ভুল?"

"হতে পারে না? বাঃ, এ-রকম তো হয়। আমাদের পাড়ার সেই সুশীলের মা'র কী হয়েছিল? মেশিনে সেলাই করতে গিয়ে ছুঁচ ভেঙে যায়, ওঁর মনে হল ভাঙা ছুঁচটা ওঁর আঙুলের মধ্যে ঢুকে গেছে।

আসলে ভাঙা ছুঁচটা কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল খুঁজে পাওয়া যায়নি। সুশীলের মা তারপর থেকে বরাবরই বলতেন, ভাঙা ছুঁচটা ওঁর শরীরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকম ডাক্তার দেখানো হল, কোনো লাভ হয়নি। ওঁর ধারণা কেউ ভাঙতে পারল না। মনে নেই তোমার সুশীলের মাকে?"

সুবীরদা বলল, "তুই বলতে চাস আমি একটা ভুল ধারণা নিয়ে বসে আছি?"

"থাকতেও তো পারো।"

"না," মাথা নাড়ল সুবীরদা। "আমি অনিলকে তা হলে কেন দেখব? কেন সে আমার চোখের সামনে রেল-লাইনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল?"

"তুমি কোথায় অনিলকে দেখেছিলে?"

"ঘাটশিলা স্টেশনের প্লাটফর্মে, একেবারে শেষ প্রান্তে।"

"সে কোন্ ট্রেনে কাটা পড়ে?"

"মালগাড়িতে।"

"আর কেউ দেখেছিল?"

"নিশ্চয়। তখন অবশ্য প্লাটফর্মে লোক কম ছিল। তবু একটা লোক কাটা পড়তে দেখলে কে না হইচই করে!"

আমার সন্দেহ হচ্ছিল। বললাম, "তুমি কাল বলছিলে তোমার বন্ধু অনিল এমনভাবে কাটা পড়েছিল যে তাকে চেনা যাচ্ছিল না!"

"হ্যাঁ, একেবারে থেঁতলে গিয়েছিল, একটা হাত আর পা অন্যদিকে ছিটকে পড়েছিল।"

"তুমি মুখ দেখতে পেয়েছিলে?"

"মুখের কিছু থাকলে তো দেখব।"

"তা হলে তুমি কেমন করে বুঝলে লোকটা তোমার বন্ধু অনিল?"

সুবীরদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল, যেন এ-রকম বোকার মতন কথা সে শোনেনি, আশাও করেনি শোনার। বিরক্ত হল বোধ হয়। বলল, "আমি বলছি অনিল।"

আমি চুপ করে গেলাম।

এমন সময় চা আর খাবার এল। মাসিমা পাঠিয়েছেন।

কিছুক্ষণ আমরা প্রসঙ্গটা আর তুললাম না। ইচ্ছে করেই। খাবার খেতে লাগলাম। মনে-মনে অবশ্য যে যার মতন ভাবছিলাম, ও একটা অন্য কথাও আসছিল। সাধারণ কথা।

সুবীরদা চা নিল। সিগারেট ধরাল।

আমিও একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলাম।

সুবীরদা বলল, "এখন বল, আমি কী করি?"

আমি বললাম, "তুমি কী করতে চাও?"

"আমি আর কী করতে পারি! করার মধ্যে ঘাটশিলায় তন্ন-তন্ন করে খোঁজ করেছি। এখনও করি। পুলিস স্টেশনেও খোঁজ খবর রাখে। এখনও। আর আমি তো দেখছিস এই অবস্থায় রয়েছি। কাজকর্ম পুরোপুরি ফেলে রাখা যায় না, অথচ ইচ্ছেও করে না। ওই কলকাতায় এসে গোঁজামিল দিয়ে ঘাটশিলায় পালিয়ে যাই।" সুবীরদা বলল হতাশ গলায়।

"তুমি যখনই কলকাতায় আসো—মৃগাঙ্ক কপিলের বাড়ি গিয়ে খোঁজখবর করে যাও?"

"হ্যাঁ।"

"তাদের বাড়ির লোককে ঘটনাটা বলনি?"

সুবীরদা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক পলক।

ইতস্তত করে বলল, "বলেছি। তবে তোর কাছে যতটা খোলাখুলি বললাম, ঠিক এভাবে বলিনি। বললে, বিশ্বাস করত না।"

আমি বললাম, "তুমি কীভাবে বলেছ?"

সুবীরদা বলল, "বলেছি, ওরা আমার সঙ্গে ছিল। তারপর কোথায় গেছে আমি জানি না।" বলে একটু থেমে সুবীরদা আবার বলল, "আমি লালবাজারেও গিয়েছিলাম। আমার এক দূর সম্পর্কের ভগ্নীপতি লালবাজারে কাজ করেন। অফিসার। তাঁকে সব বলেছি। তিনি আমার কথা শুনে পাগল ঠাওরালেন। যাই হোক, একটা স্টেটমেণ্ট লিখে দিয়ে এসেছি।"

চা খেতে-খেতে আমি জানলার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকলাম। মাথায় কিছু আসছিল না। ব্যাপারটা এমনই হেঁয়ালি, অবিশ্বাস্য যে, সুবীরদাকে ঠিক কীভাবে সাহায্য করা যায় তাও বুঝতে পারছিলাম না।

সুবীরদা হঠাৎ বলল, "ব্যাপারটা এই রকম দাঁড়িয়েছে যে, আমাকে পুলিস কেসেও ফেলা যায়।"

অবাক হয়ে তাকালাম। "কেন?"

"কেন নয়! আমরা চারজনে একসঙ্গে কলকাতা থেকে বেরিয়েছিলাম। মাঝপথে তিনজন হাওয়া হয়ে গেল। আমি ফিরে এলাম। এই তিনজন কোথায় গেল, তাদের কী হল—আমার জানার কথা। এমন তো হতে পারে, আমি তাদের খুন করেছি, করে এসে বলছি—ওরা কোথায় হারিয়ে গেছে…।"

আমি চমকে উঠলাম। কথাটা আমার মাথায় আসেনি। অবশ্য সুবীরদা খুন করবে—এটা এমনই অবিশ্বাস্য যে, কথাটা মাথায় আসার কারণ নেই। এখন, সুবীরদার কথার পর মনে হল, কেউ যদি শয়তানি করে এটা প্রমাণ করতে চায়, সুবীরদা বন্ধুদের খুন এবং গুম করে এসে এখন ন্যাকামি করছে—তবে সুবীরদাকে নিশ্চয় ঝঞ্ঝাটে ফেলতে পারে। কিন্তু সুবীরদা খুন করবে কেন? তার উদ্দেশ্য কী? এক বন্ধু তার ব্যবসার পার্টনার ছিল—ব্যবসায়িক কোনো গোলমালের জন্যে কিংবা কোনো মতলবে সেই বন্ধুকে খুন করতে চেয়েছিল সুবীরদা এটা যদি কাগজ-কলমে ধরাও যায়—তবু অন্যদের খুন করার কোনো কারণ থাকতে পারে না।

নিজের মনেই মাথা নাড়লাম আমি। অসম্ভব। খুন করার কথা ওঠে না। আইন কিংবা পুলিস যাই বলুক, যতই সন্দেহ করুক আমি বিশ্বাস করি না সুবীরদা তার বন্ধুদের খুন করার কথা স্বপ্নেও ভেবেছে!

"তোমায় কি কেউ খুনের কথা বলেছে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল সুবীরদা। "না, কেউ বলেনি। তবে পাঁচ রকম কথার মধ্যে একবার আমার সেই পুলিস আত্মীয় ঠাট্টা করে বলেছিলেন কথাটা।"

"অন্য কেউ বলেনি তো?"

"না, এখন পর্যন্ত নয়। বলেনি, কিন্তু মানুষের মন, কত রকম সন্দেহই হতে পারে।"

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল আমার। বাইরের দিকে তাকিয়ে মনে হল, বেলাও হয়েছে অনেকটা। অভ্যেস মতন ঘড়ি দেখলাম। মাত্র ন'টা বেজে আঠারো মিনিট। অসম্ভব, আমি ন'টা নাগাদ বাড়ি থেকেই বেরিয়েছিলাম। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"ক'টা বাজল, সুবীরদা?"

সুবীরদা তার ঘড়ি দেখল। "এগারোটা বত্রিশ মতন।"

ঘড়িটা খুলে নিয়ে দম দিতে লাগলাম। সেকেণ্ডের কাঁটা

লাফিয়ে-লাফিয়ে চলতে লাগল। আমার এই এক দোষ, সময় মতন ঘড়িতে দম দেবার খেয়াল থাকে না। প্রায়ই দেখেছি ঘড়ি বন্ধ হয়ে থাকে। মাঝে-মাঝে বেশ লজ্জায় পড়ি।

সময় মিলিয়ে নিলাম। ঘড়িটা হাতে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ আমার একটা কথা মনে পড়ল। খুবই বোকার মতন চিন্তা তবু মাথায় এল আচমকা। আচ্ছা, এই যে ঘড়ি—যেটা আমার হাতে বাঁধা রয়েছে, যে ঘড়ি আজ সকাল ন'টা আঠারো মিনিট পর্যন্ত বেশ চলছিল, তারপর আমার অজান্তে কখন থেমে গেছে। দু ঘণ্টারও বেশি সময় সেটা থেমেই ছিল, সেই ন'টা আঠারো বেজে; আবার এখন আমার খেয়াল হবার পর, এগারোটা বত্রিশ থেকে চলতে শুরু করল। অবশ্য দম দেবার পর। কিন্তু দু ঘণ্টারও বেশি আমার ঘড়ি চলেনি, তার কাঁটা ঘোরেনি; যে সময়টা চলে গেছে সেটা ধরে রাখেনি। কোনো সন্দেহ নেই, ঘড়ি একটা যন্ত্র এবং দম না থাকায় সেটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এমন কি হতে পারে না মানুষের জীবনেও এ-রকম ঘটে? হঠাৎ কোনো কারণে তার স্মৃতি চেতনা, বোধ, অনুভূতি সমস্ত হারিয়ে যায়?

যায়? না যায় না? যেতে পারে, কি পারে না? বড় মামার অসুখের যখন খুব বাড়াবাড়ি, তখন একদিন প্রায় একটা রাত মামার কোনো হুঁশ ছিল না। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়লেও শুনেছি তার কোনো খেয়াল থাকে না। আমাদের অফিসের এক বন্ধু—বিজন একবার স্কুটার অ্যাকসিডেন্ট করেছিল, সঙ্গে তার ভাইঝি ছিল—বাচ্চা ভাইঝি, অ্যাকসিডেন্টের পর বিজনকে কাছাকাছি একটা দোকানে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয়, হাত পা ছড়ে যাওয়া আর কপালে সামান্য কেটে যাওয়া ছাড়া

তার বিশেষ কোনো চোট লাগেনি। কিন্তু বিজন অন্তত আধ ঘণ্টা কিছুই খেয়াল করতে পারেনি, তার ভাইঝির কথাও বিজনের মনে পড়েনি। এখনও বিজন মনে করতে পারে না, কেমন করে তার অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল, কারা তাকে তুলে ধরেছিল, তার ভাইঝি কোথায় ছিল তখন?

সুবীরদার কথায় আমার হুঁশ এল। তাকালাম।

"তুই এখানেই থেকে যা দুপুরটা—" সুবীরদা বলল, "স্নান-খাওয়া কর। একেবারে সন্ধেবেলা ফিরিস।"

"বাড়িতে কিছু বলে আসিনি।"

"ফোন করে দে।"

"আমি থেকেই বা কী করব!"

"থাক না। কতদিন পরে এলি। একটা কিছু পরামর্শ দে।"

"কী পরামর্শ দেব, সুবীরদা! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে কী, সমস্ত ব্যাপারটা আমার কাছে মিস্টিরিয়াস মনে হচ্ছে। তবে, আমি তোমার কথা আর অবিশ্বাস করতে পারছি না। কিছু একটা নিশ্চয় ঘটেছে। হয়ত তোমারই কিছু হয়েছে। তোমার গঙ্গাদের যাই হয়ে থাকুক, তোমার খেয়াল নেই।"

সুবীরদা বলল, "কী হবে তাদের?"

"জানি না।"

"তুই কি মনে করিস—তাদের কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে?"

"কেমন করে বলব। তবে, আমার ধারণা, যা ঘটেছে তখন—সেদিন—তোমার কিছু মনে নেই। অনিলের ব্যাপারটা তোমার মনগড়া। অনিলকে তুমি দেখোনি।"

সুবীরদা আমার দিকে স্থির চোখে চেয়ে থাকল।

৪

রবিবার সারাটা দিনই প্রায় সুবীরদার সঙ্গে কেটে গেল
ছাড়তে চায় না আমাকে। আমি তার কোনো উপকারেই আস
ছিলাম না, আসতে পারব বলেও মনে হচ্ছিল না, তবু আমায় আট
রাখল সুবীরদা। আসলে তার মনের মধ্যে যত অশান্তি, ভয়, দুশ্চি
—সব আমার কাছে বলে যেন খানিকটা স্বস্তি পাচ্ছিল।

বিকেলের পর আমি বললাম, "এবার উঠি। পরে আবা
তোমার সঙ্গে দেখা হবে।"

"কোথায় যাবি এখন?"

"ভাবছি একবার টালিগঞ্জ ঘুরে যাই।"

"আমার বাড়ি যাবি?"

"যাই।"

কী ভেবে সুবীরদা বলল, "একটু দাঁড়া, আমিও বেরুব।"

"তুমি কোথায় যাবে?"

"নিউ আলিপুর।"

"সেখানে কে থাকে?"

"আমার উকিল বন্ধু। দেখা করার জন্যে খবর দিয়েছে, একবার
আসি।"

খানিকটা পরে আমরা বেরোলাম। রাস্তায় এসে সুবীরদা বলল,
"...দিন আমি ঘাটশিলায় যাচ্ছি। যাবি?"

"আমি গিয়ে কী করব!"

"চল না, ঘুরে আসবি। শনিবার ফিরে আসব।"

আমার অফিস, বড়মামাও পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। যাবার
...বাধে ছিল। বললাম সুবীরদাকে। সুবীরদা গ্রাহ্য করল না।
"...কটা দিন তুই ছুটি নিতে পারিস।"

রাজি হয়ে গেলাম। বললাম, "বেশ, যাব।" বলেই একটু
...সে ফেললাম। "আমি কিন্তু হাওয়া হয়ে যেতে রাজি নই।
...নে যাব।"

সুবীরদাও ম্লান মুখে হাসল। সে নিজেও ট্রেনে যায়। তার
... তো কবেই উবে গেছে।

"কাল একবার রাত্রের দিকে আমার বাড়িতে ফোন করবি।
... আমরা বম্বে এক্সপ্রেসে যেতে পারি। ইস্পাত এক্সপ্রেসে যেতে

WWW.BOIRBOI.NET

চাস যদি—তাও যাওয়া যায়। তবে ভোরবেলায় গাড়ি।"

"কাল কথা বলব।"

সুবীরদা একটা ট্যাক্সি ধরল। আমায় ভবানী সিনেমার ক নামিয়ে দিয়ে ও নিউ আলিপুরের দিকে চলে যাবে।

মামার বাড়িতে এসে দেখি, রবিবার বলে অনেকেই এসে বাড়ি ভর্তি লোক। মামাও বেশ ভালই আছেন।

আমার এক মেসোমশাই আছেন যাঁকে আমরা আড়ালে 'ট্রে আইল্যাণ্ড' বলি। কেন বলি তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। আ বড়রাই তাঁর এই নামটা দিয়েছিলেন—যেমন আমার মাম বাবাও তাঁর ভায়রা ভাইকে ঠাট্টা করে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' বলতে সুকুমার মেসোমশাই মানুষটি কিন্তু চমৎকার। একটু খেপা পোস্ট অ্যাণ্ড টেলিগ্রাফ ডিপার্টমেণ্টে চাকরি করতেন, নানা জায় ঘুরেছেন। এখন কলকাতায়। চাকরি থেকে ছুটি পেয়েছেন ছুয়েক।

সুকুমার মেসোমশাইয়ের কাছে কারও মুখ খোলার উপায় না। কিছু বললেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কোনো-না-কো অভিজ্ঞতার কথা সাল তারিখ সমেত বর্ণনা করতে শুরু করতে অর্থাৎ যে যাই বলুক—তার চেয়েও মজাদার, উদ্ভট কিছু তিনি শুনিয়ে ছাড়তেন না। সংসারের যাবতীয় ব্যাপারে তাঁর এই অভিজ্ঞতা অন্যদের চমৎকৃত করত। আনন্দও দিত। যে মানু জীবনে এত রকম অভিজ্ঞতা রয়েছে তিনি তো কম নন। হয়ত এ কারণেই তাঁর একটা ঘরোয়া, মজাদার নামকরণ হয়ে গিয়ে 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড'। মেসোমশাই সেটা জানতেন, শুনতেন,

তেন; বলতেন ঠাট্টা করে, "আছে হে আছে, আমার সিন্দুকে নেক ট্রেজার আছে; তোমরা কলকাতার বাবু—এসব বুঝবে না।"

সুকুমার মেসোমশাইকে আমার খুব পছন্দ হত। তিনি আমাকে ন অবাক করে দিতেন কথায় কথায়, তেমনি আবার হাসাতেও পারতেন।

আমার হঠাৎ খেয়াল হল, সুকুমার মেসোমশাইকে একবার জেস করলে হয় কথাটা। তিনি তো অনেক খোঁজ-খবর রাখেন, মন কোনো খবর রাখেন কিনা যেখানে মানুষ এবং গাড়ি বাতাসে লিয়ে যেতে দেখেছেন বা শুনেছেন।

সুকুমার মেসোমশাইকে একটু আলাদা করে টেনে এনে আমি লাম, "মেসোমশাই, আমার একটা সাঙ্ঘাতিক কথা আছে। পনাকে শুনতে হবে।"

"বলে ফেল, শুনছি।"

"ও পাশটায় চলুন। বসি।"

দোতলার বারান্দার এক পাশে চেয়ার-টেয়ার পড়ে ছিল। মরা বসলাম। বাতি জ্বলছিল হাত কয়েক দূরে।

মেসোমশাই সর্বক্ষণ চুরুট খান। তিনি চুরুট টানতে লাগলেন।

আমি সুবীরদার নামধাম বললাম না। বাকি প্রায় সবটাই কে শোনালাম, সুবীরদার কাছে যা শুনেছি।

মেসোমশাই মাঝে মাঝে দু-একটা কথা বললেও অত্যন্ত নোযোগের সঙ্গে আমার কথা শুনছিলেন। তাঁর আগ্রহ প্রবল ঠেছিল। চুরুট নিবে যাচ্ছিল বারবার।

আমার কথা শেষ হবার পর মেসোমশাই কিছুক্ষণ কোনো কথাই ললেন না। বার কয়েক বড় বড় নিশ্বাস ফেললেন। একেবারে

চুপচাপ। দোহারা চেহারার মানুষ, লম্বা ছাঁদের মুখ। মাথার
কাঁচা-পাকা। চোখে চশমা।

মেসোমশাইকে চুপচাপ দেখে মনে হল, এইবার তিনি
হয়েছেন, আমার ওপর টেক্কা দেবার মতন কোনো গল্প তাঁর পুঁ
নেই।

আরও খানিকটা পরে মেসোমশাই মুখ খুললেন। বললেন,
রকম ঘটনার কথা আর একটা মাত্র শুনেছি। নিজে কখনো চো
দেখিনি। কিন্তু শুনেছি।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "শুনেছেন?"

মেসোমশাই বললেন, "শুনেছি। আমার বড়দার মুখে। আ
বড়দা রেলের কনস্ট্রাকশানে চাকরি করতেন। সে তো অনেক কা
কথা। কর্ড লাইন কনস্ট্রাকশানের সময় কোডারমার কা
একটা খোলা মালগাড়ি হারিয়ে যায়। তখন খোলা মালগা
মাথায় তেরপল চাপিয়ে রেল লাইনে কাজ করার জন্যে কুলি
নিয়ে যাওয়া হত। যেখানে কাজ হচ্ছে, তারই আশেপাশে ব
কুলি লাইন। ছাউনি পড়ত, কুলিটুলি থাকত, কাজকর্ম করত, থা
ছাউনিতেই। একবার একটা খোলা মালগাড়ি হারিয়ে যায়। অ
তাতে কোনো কুলি ছিল না।"

আমি বললাম, "কেমন করে হারাল কেউ বলতে পারেনি?"

"না। রেলের লাইন থেকে অত ভারী, বেশ কয়েক টন ওজ
মালগাড়ি হারিয়ে গেল কেমন করে তার কোনো হদিশ করা যায়নি
ও-রকম একটা ঘটনার পর কুলি-ছাউনিতেও কেউ থাকতে চাইল
ভয়ে। পালাতে লাগল। রেল কোম্পানি ফাঁপরে পড়েছিল খুব।"

"ভৌতিক ব্যাপার!"

"আমার কিন্তু অন্য রকম মনে হয়।"

আমি তাকিয়ে থাকলাম।

মেসোমশাই একটু চুপ করে থেকে বার দুই টান দিলেন চুরুটে,
ধোঁয়া বোধহয় মুখে এল না। উনি বললেন, "ব্যাপারটা ভৌতিক
নয়, রহস্যময়। তুমি কি জানো জগদীশ, গত একশো বছরে এই
পৃথিবীর নানা জায়গায় এমন সব ঘটনা ঘটেছে যার কোনো ব্যাখ্যা
পাওয়া যায়নি! কারণও খুঁজে বার করা সম্ভব হয়নি। এশিয়া
এবং য়ুরোপের নানা জায়গায় কখনো-কখনো আচমকা কিছু ছিটকে
এসে পড়েছে শূন্য থেকে। তার সবই উল্কাপাত নয়। আবার
আকাশের দিকে তাকিয়ে এমন কিছু কিছু আশ্চর্য জিনিস আচমকা
কোনো জায়গায় চোখে পড়েছে যাকে আমরা ঠিক ধূমকেতুও বলতে
পারি না।"

আমি অবাক হচ্ছিলাম। বললাম, "আপনি কি বলতে
চাইছেন—"

হাত উঠিয়ে আমায় থামতে বলে সুকুমার মেসোমশাই বললেন,
"শোনো। আমার কথাটা আগে শুনে নাও। সাল-তারিখ
আমার কিন্তু মনে নেই, তবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জার্মানদের
এক মিলিটারি হাসপাতাল থেকে জনা চারেক হাত-কাটা পা-কাটা
সৈন্য চুরি হয়ে যায়। এমন জায়গা থেকে চুরি হয়েছিল, যেখানে
শত্রু পক্ষের লোক কোনোভাবেই ঢুকতে পারে না। জাপানের
সমুদ্র থেকে মাছ ধরার জাহাজ উধাওয়ের খবরও পড়েছি কাগজে।
গ্রীনল্যাণ্ডে একটা তেকোণা অদ্ভুত কী জিনিস এসে পড়েছিল একবার,
তারপর সেটা আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।"

"ফ্লাইং সসারস?"

“হতে পারে, কেমন করে বলব। তবে, তুমি নিশ্চয় শুনে এই যে এত জাহাজ সারা পৃথিবীতে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে —এদের মধ্যে কেউ কেউ কখনো কখনো অদ্ভুত এক সাংকেতিক বার্তা তাদের জাহাজের রেডিও-ঘরে শুনতে পেয়েছে। তারা কোনো অর্থ ধরতে পারেনি। ১৯২৫ সালে ভারত মহাসাগরে একটা ইটালিয়ান জাহাজে এরকম এক সাংকেতিক বার্তা শোনা গিয়েছিল।”

“হতে পারে,” আমি বললাম, “মাঝে-মাঝে কাগজে এ রকম খবর তো পড়াই যায়।”

সুকুমার মেসোমশাই বললেন, “ব্যাপারটা নিয়ে নানা জনের নানা মত। কেউ কেউ মনে করেন, ও-সব বানানো গল্প। কেউ কেউ মনে করেন, অন্য কোনো গ্রহের জীব হাওয়া খেতে বেরিয়ে পৃথিবীর লোকের সঙ্গে একটু তামাশা করে গেছে।”

আমি নিশ্বাস ফেলে বললাম, “গ্রহান্তরের মানুষ!” বলে হাসলাম।

মেসোমশাই বললেন, “মানুষ নয়। মানুষ বলো না। মানুষ তো পৃথিবীর জীব। গ্রহান্তরের প্রাণী বলতে পারো।”

“আপনি এইসব আজগুবি গল্প বিশ্বাস করেন?”

মেসোমশাই এবার চুরুটটা ধরালেন। ধোঁয়া টানলেন বার কয়েক। তারপর বললেন “আমার বিশ্বাসে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগদীশবাবু, তুমি আমার একটা কথার জবাব দাও তো। তুমি নিশ্চয় জানো, এখন এই পৃথিবীর মানুষ চাঁদে নেমে চাঁদের খবরাখবর জেনে আসছে, তার মাটিও নিয়ে আসছে। ঠিক তো?”

“তা ঠিক। তবে চাঁদের মাটি বলাটা ঠিক নয়।”

“ওই একই হল। সোজা বাংলায় মাটিই ধরে নাও...। তা আমরা যদি আজ চাঁদে নেমে মাটি তুলে আনতে পারো, তবে অন্য গ্রহের জীব তোমাদের এই পৃথিবী থেকে কিছু নিয়ে যেতে পারে না স্যামপল্ হিসেবে?” বলে মেসোমশাই মুচকি হাসলেন।

আমি বললাম, “অন্য গ্রহে জীব আছে এটা তো প্রমাণ হয়নি?”

“প্রমাণ এখন পর্যন্ত হয়নি। কিন্তু প্রমাণ হয়নি বলে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে পারো না। আমরা অন্য গ্রহ সম্পর্কে কতটুকু জানতে পেরেছি! কেউ জোর করে এ-কথা বলতে পারে না যে, পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে জীব নেই।”

আমি বললাম, “জীবনের—মানে জীবজগৎ সৃষ্টি হবে এমন আবহাওয়া কিংবা উপাদান যদি না থাকে তাহলে কেমন করে হবে?”

মেসোমশাই বললেন, “কথাটা তুমি ঠিকই বলেছ। তবে আমার কথা যদি ধরো—আমি তোমার কথাটা মানতে পারব না। অনেকে বলেন, আমাদের পৃথিবীর জীব-জগৎই বলো আর প্রাণী-জগৎই বলো, সবই তার পারিপার্শ্বিক থেকে গড়ে উঠেছে। মানে -যাকে কিনা বলে এনভায়রনমেন্ট—আমরা সেই এনভায়রনমেন্ট থেকে গড়ে উঠেছি। আমরা মানুষ—ডাঙা ছাড়া আমাদের চলে না, মাছ হয়ে জন্মালে ডাঙাটাই আমাদের কাছে অচল হত, আমরা চাইতাম জল। ...অন্য গ্রহের জীবরা, ধরে নাও যদি থেকে থাকে, তারা আমাদের পরিবেশে নেই, নিজেদের পরিবেশের মধ্যেই রয়েছে। পরিবেশকে খাপ খাইয়েই তাদের জীবন। তাদের কাছে তাদের জগৎটাই খাশা জায়গা। কোনো অসুবিধেই বোধ করে না। তাদের বেঁচে থাকার প্রসেসটাই আলাদা।”

মেসোমশাইয়ের সঙ্গে কথা বলার ধৈর্য আর আমার থাকল না।

বলতে এলাম এক কথা, আর তিনি কোথায় উদ্ভট গল্পে চ
গেলেন। অবশ্য সুকুমার মেসোমশাই এই রকমই। এক জায়গা
শুরু করলে অন্য জায়গায় টেনে নিয়ে যান। তবে অন্য সময় তাঁ
কথায়-বার্তায়-গল্পে একটা মজার ভাব থাকে, আজ কিন্তু সে রক
কিছু ছিল না। তিনি যেন রীতিমত বিশ্বাসই করে নিয়েছেন যে
অন্য গ্রহেও জীব থাকতে পারে।

গুরুজন মানুষ, তা ছাড়া লোকটি বড় চমৎকার, ওঁকে অবজ্ঞ
করা উচিত নয়। বললাম, "আপনি যা বলছেন তা বিশ্বাস কর
মুশকিল। তবে একেবারে অসম্ভব হয়ত নয়। যাকগে, আমি বাড়ি
ফিরব। সকালে বেরিয়েছি। আপনি আরও কিছুক্ষণ থাকবে
নাকি?"

মেসোমশাই ঘাড় হেলিয়ে বললেন, "আমার খানিকটা দে
হবে যেতে। তুমি বরং এসো।"

আমি উঠে পড়লাম।

মেসোমশাই বললেন, "তোমায় একটা কথা বলি জগদীশ
এটা আমার নিজের ধারণা। আমাদের জ্ঞান-ট্যান যা বলে তা
চেয়েও এই জগৎ বলো পৃথিবী বলো অনেক জটিল; রহস্যময়
পৃথিবীটা যে গোল, এটাই মানুষ জানতে শিখেছে সেদিন
আমরা এখন পর্যন্ত যা জেনেছি তার চেয়েও না-জানাই বেশি রয়ে
গেছে পৃথিবীতে। এই জগতের কোথায় কী ঘটছে তার খোঁজ
রাখাই দায়, কেন ঘটছে তা বলা আরও মুশকিল। তুমি কি জানো
কেন প্রতি বছর একবার করে কোথাও-না-কোথাও বিরাট এক
ভূমিকম্প হয়? বছরে শ'খানেক ছোট-বড় ভূমিকম্পের মধ্যে এ
হল সবচেয়ে বিরাট। কেন হয়?"

আমি কোনো জবাব দিলাম না। দেবার কিছু ছিল না
আমার। তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে নীচে নেমে এলাম।

নীচে তখন বসার ঘরে জোর আড্ডা জমেছে। মামাতো
মাসতুতো ভাইবোনেরা হইহই করছিল। বাড়ির মধ্যে এতদিন যে
থমথমে, অসুখ-অসুখ ভাবটা ছিল, তা কেটে যাওয়ায় সবাই খুশি,
নিশ্চিন্ত।

আমার মামাতো ভাই নিখিল একটা টেপ রেকর্ডার মেশিন
জুটিয়ে এনেছে কার কাছ থেকে, এর ওর গান, কথা, হাসি রেকর্ড
করছিল, আর বাজিয়ে শোনাচ্ছিল। তাই নিয়ে হুল্লোড় জমেছে।

ওদের হাত এড়িয়ে আমি পালিয়ে এলাম বাইরে।

ফেরার সময় ট্রামে আমি মেসোমশাইয়ের কথাগুলোই
ভাবছিলাম।

আজগুবি ধরনের গল্পটল্প আমি দু-চারটে না পড়েছি এমন নয়।
সিনেমাও দেখেছি এক আধটা। কিন্তু গল্প গল্পই, সেটা বিশ্বাস
করার কোনো মানে হয় না। অন্য কোনো অজানা গ্রহ থেকে
মানুষ—না মানুষ নয়—কোনো প্রাণী এসে এ পৃথিবীতে নামে,
এখানকার হালচাল দেখে যায়, খোঁজখবর করে যায় আমাদের,
এ-সব কথা গল্প হিসেবে পড়তে ভালই লাগে, তা বলে এমন ঘটনা
সত্যি কি ঘটে?

আমার মনে হল না, ঘটে। মেসোমশাই যাই বলুন, আমি
কথাটা বিশ্বাস করি না। অন্য কোনো গ্রহের জীবদের কাজ নেই,
সুবীরদাদের ছোঁ মেরে নিয়ে যেতে এসেছিল? আর সবেই যদি তবে
তার কোনো চিহ্ন থাকবে না? আর ধরেও বা যদি নিয়ে যায়,
তবে আবার সুবীরদাকে ফেরত দিয়ে যাবে কেন? কেনই বা

অনিলবাবু ফেরত আসবে? গ্রহান্তরের জীবদের তামাশাটা মন্দ নয়। ছেলেধরার মতন ধরে নিয়ে যায় এই পৃথিবীর মানুষদের। আবার ভালয়-ভালয় ফেরতও দিয়ে যায়। হয়ত মৃগাঙ্কবাবু আর কপিল ড্রাইভার—মায় গাড়ি সমেত ফেরত আসবে।

হাসি পাচ্ছিল আমার। হেসে ফেললাম।

"টিকিট?"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি ট্রামের কণ্ডাক্টর। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন হাসি দেখছে আমার। ভাবছে আমি বুঝি কোনো পাগল-ছাগল।

বিব্রত বোধ করে পয়সার জন্যে পকেটে হাত ঢোকালাম। পকেট ফাঁকা। মানি-ব্যাগ যে কখন অদৃশ্য হয়ে গেছে জানি না।

৫

পরের দিন সুবীরদাকে বাড়িতে ফোন করলাম।

সুবীরদাই ফোন ধরল। "জগু?"

"তুমি কাল যাচ্ছ তো?"

"হ্যাঁ। কেন?"

"এমনি জিজ্ঞেস করলাম। আমি অফিসে ছুটি নিয়েছি।"

"বেশ করেছিস। কাল বম্বে এক্সপ্রেসেই যাব। তুই সোজা হাওড়া স্টেশনে চলে আসবি।"

"কখন ?"

"একটা দেড়টা নাগাদ আয়। সকালে ইস্পাত এক্সপ্রেস ছিল। হবে না। বম্বে এক্সপ্রেসই ভাল।"

"ঠিক আছে, চলে আসব।...কিছু নিতে হবে ?"

"জামাকাপড় ছাড়া কিছু নয়।"

একটু চুপ করে থেকে হেসে বললাম, "কাল আমার পকেটমার হয়ে গিয়েছিল—বুঝলে, সুবীরদা। এই প্রথম, না। দ্বিতীয়বার বলতে পারো।"

"সে কী রে!"

"কেমন করে হল কে জানে! অন্যমনস্ক ছিলাম খুব।"

"বাড়ি ফিরলি কেমন করে ?"

"কিছু খুচরো পকেটে ছিল ; টাকাখানেক মতন।"

সুবীরদা হাসল।

আমি বললাম, "হেসো না, তোমার জন্যে এই লোকসান! কী যে এক বিদঘুটে জিনিস মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছ!" বলে একটু থেমে হঠাৎ বললাম, "কাল আমার এক মেসোমশাই আমাকে একটা থিয়োরি শোনাল। ভেরি ইন্টারেস্টিং।"

"থিয়োরি! কিসের থিয়োরি ?"

আমি হালকা গলায় বললাম, "তোমাদের কি অন্য কেউ ধরে নিয়ে গিয়েছিল ?"

"ধরে নিয়ে...! কারা ?"

"অন্য কোন গ্রহের জীব!" বলে আমি হাসলাম। ঠাট্টার সুরে বললাম, "মঙ্গল-টঙ্গল থেকে কোনো স্পেস-শিপ এসেছিল কিনা ভেবে দেখ।"

সুবীরদা আমার কথার কোন জবাবই দিল না কিছুক্ষণ, তারপর বলল, "তোর মেসোমশাই এ-কথা বলেছেন! আশ্চর্য! আমারও মাঝে-মাঝে এ-রকম মনে হয়েছে।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "তোমারও মনে হয়েছে! অদ্ভুত ব্যাপার!"

"না না, আমার সেভাবে কিছু মনে হয়নি। তবে কথাটা ভাবতে-ভাবতে যখন কোনো কারণই খুঁজে পাই না, তখন ওই রকম একটা অসম্ভব ব্যাপার মনে হয়, এই আর কি!...যাক গে, এসব কথা পরে হবে। আমি একজনের জন্যে বসে আছি। তাঁর আসার কথা।"

"ঠিক আছে, কাল আমি সময় মতন হাওড়া স্টেশনে হাজির হচ্ছি। এখন শীত কেমন ঘাটশিলায় ?"

"বেশ শীত।"

ফোন রেখে দিলাম।

আমাদের বাড়িটা পুরনো। সংসারটাও ছোট নয়। আজকাল জায়গার টানাটানি চলছে। তেতলার উপর যে দেড়খানা ঘর, তার একটা আমার ভাগে পড়েছে। বাকি অর্ধেকটা দখল করেছে আমাদের বাড়ির নিত্যদা। বাবার আমলের মানুষ। বাবার ধারণা, নিত্যদা ছাড়া তাঁকে কেউ দেখে না। বুড়ো মানুষদের মাথায় কত যে উদ্ভট ধারণা জন্মায় আমার বাবাকে দেখেই বুঝতে পারি।

দোতলায় ফোন সেরে তেতলায় নিজের ঘরে এসে শুয়ে পড়লাম। আজ আর কোথাও বেরুবার নেই। কাল সকালে

WWW.BOIRBOI.NET

উঠে জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নেব। তারপর সোজা হাওড়া স্টেশন।

বাড়িতে ঘাটশিলার কথা বলেছি। মানে, মাকে বলেছি, দি
চারেকের জন্যে ঘাটশিলায় বেড়াতে যাচ্ছি।

বিছানায় শুয়ে আরাম করে একটা সিগারেট ধরালাম। তারপ
এ-কথা সে-কথা ভাবতে গিয়ে সুবীরদার কথাই আবার ভাবতে
লাগলাম।

খুব ভাল করে ভাবলে আমার মনে হয়, সুবীরদার ব্যাপারটা
সঙ্গে গ্রহ-ট্রহের কোনো সম্পর্ক নেই। গ্রহান্তরের জীব এই পৃথিবীতে
আসে এমন মনে করার কোনো কারণ আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

সমস্ত ব্যাপারটা খুঁটিয়ে দেখলে কী দেখব? দেখব যে, মা
একটি কারণেই এ-রকম হতে পারে। সুবীরদা যা যা বলছে তা যদি
সত্যি হয়, তবে সেদিন নিশ্চয় গাড়িটা অ্যাকসিডেন্ট করেছিল। যে
কোন কারণেই হোক, নিতান্ত কপাল-জোরে সুবীরদা বেঁচে গেলেও
তার মাথায় এমন কোনো জায়গায় চোট লেগেছে যে, সে অনেক কি
ভুলে গিয়েছে। তার মনে পড়ছে না, গাড়িটার সমস্ত আলো হঠাৎ
নিভে যাবার পর কী হয়েছিল! এ-রকম বিস্মৃতি, সাময়িক বিস্মৃতি
ঘটতে পারে মানুষের। অসম্ভব নয়।

অন্যদের তা হলে কী হল?

আমার মনে হয়, অন্যরা জীপ অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছে।

যদি তাই হয়, তবে অন্যদের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া গেল না
কেন? গাড়িটাই বা কোথায় গেল?

এ-প্রশ্নের জবাব এখন আমার মাথায় আসছে না। জায়গাটা
দেখতে হবে। যদি এমন হয় আশে-পাশে অনেক ঝোপ-জঙ্গল
রয়েছে, নদীতে জল রয়েছে, তোড়ও আছে—তা হলে ধরে নিতে হবে

সুবীরদার বন্ধুরা আর গাড়ি হয় ভেসে গেছে, না হয় এমন এক
জায়গায় পড়ে আছে যা চোখে ধরা যাচ্ছে না।

কিন্তু সুবীরদা বলছে, তন্ন তন্ন করে সব খোঁজা হয়েছে।

আমার বিশ্বাস খোঁজা হয়নি। খুঁজতে হবে।

তা হলে অনিলের রেল-লাইনের ওপর ঝাঁপ খাওয়া?

ওটা সুবীরদার কল্পনা। অনিলের মতন কেউ হয়ত ঝাঁপ খেয়েছিল
-অনিল নয়, সুবীরদা ধরে নিচ্ছে অনিলই ঝাঁপ খেয়েছে। চোখের
ভ্রম এবং মতির ভ্রম।

যদি আমার এই ধারণা মিথ্যে হয়, তা হলে বলতে হবে,
সুবীরদার পুরো গল্পটাই বানানো। সে তার বন্ধুদের খুন করেছে,
গাড়িটা কোথাও লুকিয়ে রেখেছে, তারপর নিজের দোষ চাপা দেবার
জন্যে মনগড়া গল্প বলছে, পাগল-পাগল ভান করে দিন কাটাচ্ছে।

কিন্তু আমি সুবীরদাকে কখনোই এত নৃশংস, হীন, শয়তান ভাবি
না। কাজেই খুনটুনের কথা ওঠে না।

সিগারেট কখন শেষ হয়ে গিয়েছিল। মাথাটাও ধরা-ধরা লাগল।
উদ্ভট চিন্তা আর ভাল লাগছিল না। উঠে বসে কী করব কী করব
ভাবতে গিয়ে হঠাৎ আমার ট্রানজিস্টারের দিকে চোখ পড়ল।

ট্রানজিস্টারটা চালিয়ে দিয়ে বিছানায় এনে রাখলাম।

গান হচ্ছিল। শ্যামা সঙ্গীত।

ভাল লাগছিল না। বন্ধ করে দিলাম।

বন্ধ করে শুয়ে আছি, হঠাৎ আমার সাধারণ একটা কথা মনে
পড়ল। তারপরই মনে পড়ে গেল কালকের টেপ রেকর্ডারের কথা।

এমন-কিছু চমকে যাবার মতন ঘটনা নয়, এখন তো সবই জল-
ভাতের মতন সহজ সাধারণ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু আগে কি মানুষ

জানত, না বিশ্বাস করত, তার মুখের কথা এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রা
পর্যন্ত ছড়িয়ে দেওয়া যায় পৃথিবীর? সে কি ভাবতে পারত, এ
কথাটা বলল এখন, কিংবা যে গান গাইল—সেটা খুব সহজেই ধ
রাখা যায়—মাসের পর মাস বছরের পর বছর! একদিন মানুষ এ
সব জানত না, বিশ্বাসও করত না। ভাবত, মুখের কথা মুখেই ফুরি
যায়, হারিয়ে যায় বাতাসে। আজ আর সে কথা ভাবে না। ব
তার কাছে রেকর্ড, রেডিয়ো, টেপ রেকর্ডার—কোনোটাই আর অবা
হবার মতন জিনিস নয়, গ্রাহ্যও করে না—ভাবতেও চায় না কেম
করে এত আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে!

এই জগতে এটাই সবচেয়ে মজার। প্রথম কিছু ঘটে যখন, তখ
সারা পৃথিবী তোলপাড় হয়ে যায়, তারপর মানুষ ধরে নেয়, এ আ
নতুন কী, অবাক হবারই বা আছে কী তেমন? মাত্র সেদিন মানু
একটা কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠিয়ে দিল শূন্যে, পৃথিবীর চারপাশে পা
থেকে লাগল উপগ্রহটা। তাবৎ দুনিয়া পাগল হয়ে উঠল, রই-র
লেগে গেল। এখন উপগ্রহ, রকেট, চাঁদে নামা—এসব আ
মানুষকে মোটেই অবাক করে দিচ্ছে না, সবাই ভাবছে ব্যাপার
স্বাভাবিক।

প্রথম ধাক্কাটা সয়ে গেলে সবই স্বাভাবিক। গত কালকের কো
কাগজে যেন বেরিয়েছে নিউট্রন বোমা এমনই অদ্ভুত বোমা যা মানু
মারবে—অথচ ঘরবাড়ি রাস্তাঘাট প্রায় কিছুই নষ্ট করবে না। অর্থা
এবার যদি কখনো যুদ্ধ লাগে, শহর-টহর ধ্বংস না করে শু
মানুষ আর প্রাণীটানি মেরে দিব্যি দেশ-টেশ দখল করা যাবে
আশ্চর্য!

যদি এত রকম ঘটনা এই পৃথিবীতে ঘটতে পারে, তবে মেসোমশা

যা বলেছেন তাও না ঘটার কী আছে? মানুষকে নিমেষে অদৃশ্য করার যন্ত্রও তো আবিষ্কার করা সম্ভব। এই পৃথিবীতে সম্ভব। আবার হতেও পারে, অন্য গ্রহ থেকে কোনো জীবটিব এসেছিল, এসে মানুষ চুরি করে পালিয়েছে।

আমার মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। আর ভাবতে পারলাম না।

৬
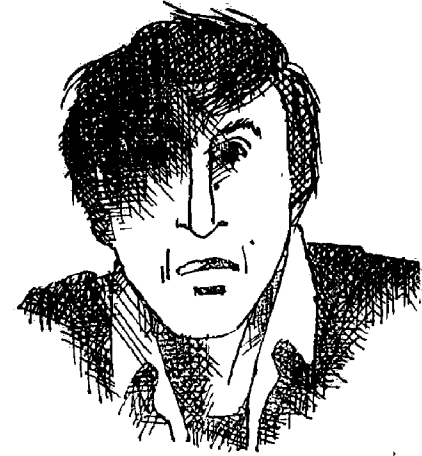
হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দেখি সুবীরদা বুকস্টলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তার পায়ের কাছে একটা বড়সড় স্যুটকেস। আমার দিকে চোখ পড়তেই হাত তুলল।

কাছে গিয়ে বললাম, "কতক্ষণ এসেছ?"

"মিনিট দশ।" বলে আমার কাঁধে-ঝোলানো ক্যামেরার দিকে তাকাল। "ক্যামেরাও নিয়েছিস?"

"নিয়ে নিলাম। ভাবলাম, বেড়াতেই যাচ্ছি যখন সঙ্গে থাক।
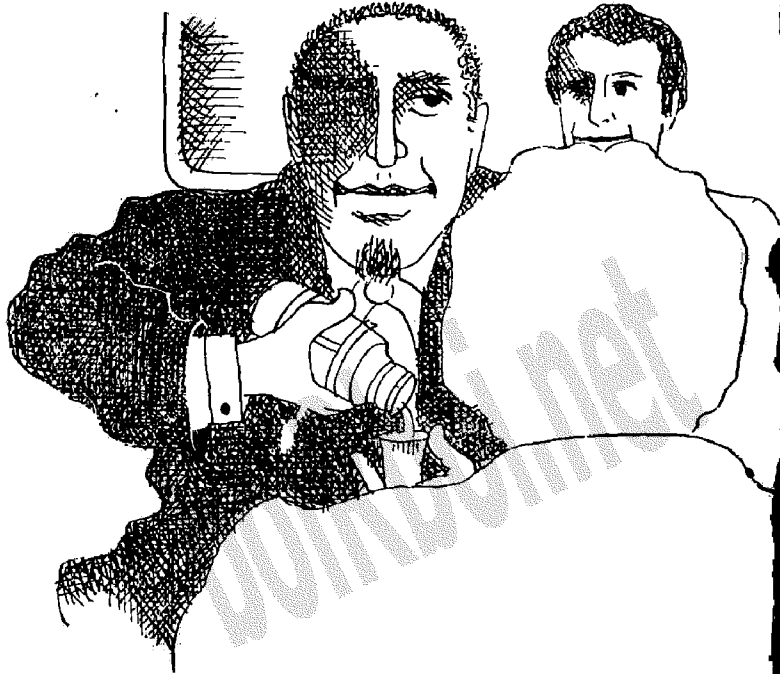
তোমার ঘাটশিলা শুনেছি ভাল জায়গা, ছবিটবি তোলা যাবে।"

সুবীরদা একটু হাসি-হাসি মুখ করল।

আমার সঙ্গে জিনিসপত্র বেশি ছিল না, ফোম লেদারের একটা ব্যাগ আর এক মিলিটারি কম্বল, গায়ে চাপালে ছাল-চামড়া উঠে আসে। নেহাত দায়ে পড়ে নিয়েছিলাম কম্বলটা। মা যা বকবক শুরু করল, না নিয়ে উপায় ছিল না।

বললাম, "টিকিট হয়েছে?"

"হ্যাঁ।"

"তা হলে আর দাঁড়িয়ে কেন! চলো, প্ল্যাটফর্মে যাই।"

সুবীরদা অন্য দিকে তাকিয়ে, মানুষজন যেদিক দিয়ে আসছে। যেন কাউকে খুঁজছে। বলল, "একটু দাঁড়া, আরও একজনের আসার কথা আছে।"

বুঝতে পারলাম না। "আবার কে?"

"তালুকদার-সাহেব। বিশ্বরঞ্জন তালুকদার।"

"তিনি আবার কে?"

"কমল—আমার সেই নিউ আলিপুরের উকিল বন্ধু—তার বড় শালা।"

ঠিক বুঝতে পারলাম না। গতকাল ফোনে যখন কথা হয়েছিল তখনও সুবীরদা বলেনি সঙ্গে অন্য লোক থাকবে। বললাম, "তালুকদার-সাহেবও কি এমনি বেড়াতে যাচ্ছেন, না তুমি নিয়ে যাচ্ছ?"

সুবীরদা সামান্য অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "উনি নিজেই যাচ্ছেন। ব্যাপারটা কী হল জানিস? কমল তার বড় শালা তালুকদার-সাহেবের কাছে আমার ব্যাপারটা বলেছিল। শুনে ভদ্রলোক

নিজেই নাকি যেতে চাইলেন।"

"ও।"

"না না, আমি ওঁকে বলিনি। উনি নিজেই গরজ করে যেতে চাইলেন। কাল সন্ধের পর আমার বাড়িতে এসেছিলেন। তো ফোন পাবার পর এসেছিলেন।"

"কী করেন ভদ্রলোক?"

"কলকাতার লোক নন। নাগপুরের দিকে থাকেন। পারিবারিক কাজে কলকাতায় এসেছিলেন। খিদিরপুরে ওঁদের বাড়ি, ভাইটাই আছে।"

আমিও তাকিয়ে থাকলাম ভিড়ের দিকে। কে যে তালুকদার-সাহেব, চিনি না। তবু বড় ঘড়িটার দিক থেকে যারা আসছিল তাদের দেখতে লাগলাম।

সুবীরদা বলল, "তুই টেরাটোলজিস্ট মানে জানিস?"

"কী? টেরা—, কী বললে তুমি?"

"টেরাটোলজিস্ট। তাই তো শুনলাম।"

"না! লাইফে ও-সব শুনিনি। এ-সব বিদ্ঘুটে শব্দ তুমি কোথায় পাও?"

"আমি কেন পাব, তালুকদার-সাহেব নিজেই বললেন, তিনি টেরাটোলজিস্ট।"

বলতে যাচ্ছিলাম, "তোমার তালুকদার-সাহেব নিশ্চয় ছিটো-লজিস্ট", এমন সময় দেখলাম সুবীরদা হাত তুলে যেন কাকে ডাকছে।

তাকিয়ে দেখি, লম্বা দোহারা চেহারার এক ভদ্রলোক। গায়ের রঙ কালো, চোখা নাক, চোখ ছোট-ছোট, থুতনির কাছে বাহারি দাড়ি। পরনে চেককাটা টুইডের কোট, গোটা চারেক পকেট, ছাই রঙের প্যান্ট। তাঁর পেছনে একটা কুলি, স্যুটকেস বেডিং বয়ে নিয়ে আসছে।

তালুকদার-সাহেবকে দেখেই আমার মনে হল, ভদ্রলোকের পোশাকই শুধু নয়, চেহারাটাও যেন বাইরের ছাঁট কাটে তৈরি।

সুবীরদা ডাকল। "এই যে—এখানে।"

তালুকদার দেখতে পেয়েছিলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছতে-মুছতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। "আমি লেট্ করলাম। ট্যাক্সি পাওয়া একটা প্রবলেম।"

সুবীরদা আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল তালুকদার-সাহেবের। তারপরই বলল, "চলুন আমরা যাই। ট্রেন ইন্ করে গেছে।"

আমারও মনে হল, আর দেরি করা উচিত নয়।

গাড়িতে আমাদের বসার অসুবিধে হল না। বরং বলতে পারি, খানিকটা আরামেই বসতে পারলাম।

আমি আর সুবীরদা মুখোমুখি। সুবীরদার পাশে তালুকদার-সাহেব।

গাড়ি ছাড়ল।

তালুকদারকে আমি ভাল করে লক্ষ করে দেখলাম, ভদ্রলোকের চোখ দুটি ঠিক ছোট নয় কিন্তু উনি বড় করে চোখ খুলতে পারেন না, পাতা দুটো যেন প্রায় বুজে থাকে। তা ছাড়া অনবরতই চোখে জল আসে ভদ্রলোকের। চোখে এবং নাকে। রুমালে নাক-চোখ মোছা যেন তাঁর এক মুদ্রাদোষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না তালুকদারের বয়েস কত হতে পারে। আমাদের চেয়ে বয়েসে তিনি বড়; তবে অনেক বড় বলে মনে হল না। চল্লিশের বেশি বলে মনে হয় না। মাথার চুল

কোঁকড়ানো, ছোট-ছোট, কালো। গলার স্বর খানিকটা মোটা। তেমন কিছু গম্ভীর মানুষও নন।

গাড়িতে আমরা গুছিয়ে বসার পর তালুকদারই কমলালেবু খাওয়ালেন আমাদের। কমলালেবুর পর কফি। ফ্লাস্কে করে কফি এনেছিলেন তালুকদার, কাগজের গ্লাসও ছিল সঙ্গে। কফি খেতে খেতে মজার-মজার গল্প করছিলেন।

আমাদের আশেপাশে বাঙালি যাত্রী দু-চার জন ছিলেন, অবাঙালিই বেশি। গাড়ি ভালই ছুটছিল। আমরাও গল্পগুজব করছিলাম। সাধারণ কথাবার্তা। তালুকদার কেমন করে ট্রেন থামিয়ে একবার অগ্নিকাণ্ড থেকে বেঁচেছিলেন সেই গল্প বললেন। ঘটনাটা ঘটেছিল পারাসিয়ার দিকে, ছোট লাইনে।

আমি তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি বরাবর নাগপুরে আছেন ?"

মাথা নাড়লেন তালুকদার। "না না, বরাবর থাকব কেন, বছর দুই রয়েছি। এবার বোধ হয় সাউথে কোথাও পাঠিয়ে দেবে।"

"আগে কোথায় ছিলেন ?"

"বম্বে। তার আগে সিমলা। সিমলায় আসার আগে নেপাল বর্ডারে ছিলাম কিছুদিন।"

"কলকাতা ছেড়েছেন কতকাল ?"

"ছাড়ব কেন ! কলকাতাকে কি ছাড়া যায় মশাই ? ছুটিছাটা পেলেই বাড়িতে পালিয়ে আসি। তবে সাত-আটটা বছর বাইরে বাইরেই কাটছে বলতে পারেন।"

আমার লজ্জা করছিল। উনি আমায় বারবার আপনি করে কথা বলছেন। আগেও একবার বলেছি, আবার বললাম, "আপনি আমায় আপনি-আপনি করবেন না।"

তালুকদার হাসলেন। "বেশ।"

সুবীরদা বাইরের দিকে তাকিয়ে ছিল। বলল, "খড়্গপুর চলে এল প্রায়।"

বাইরে বিকেল পড়ে যাচ্ছিল। শীতের শেষ দুপুর। রোদ মরে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। মাঠের ওপর পাতলা ধুলোর রঙ ধরে আছে। দূরে—যেখানে আকাশ নিচু হয়ে মাঠে নেমেছে, এক আধটা ছোটখাট গ্রাম হয়ত, কিংবা জঙ্গল। দূরে তাকালে গাছপালার মধ্যে ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব চোখে পড়ে।

তালুকদার-সাহেবের সঙ্গে আমার আলাপ মোটামুটি জমে গেছে ভেবে আমি এবার বিনীতভাবে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, টেরাটোলজিস্ট মানে কী ?"

তালুকদার আমার দিকে আধ-বোজা চোখে তাকালেন। বোধ হয় মজা পেলেন। তাঁর হাতে রুমাল ছিল। নাক মুছলেন, "কেন ?"

"শুনলাম আপনি টেরাটোলজিস্ট। সুবীরদা বলছিল।"

তালুকদার সুবীরদার দিকে তাকালেন। তারপর আমার দিকে। বললেন, "টেরাটোলজিস্ট বলতে অনেক রকম মানেই বোঝাতে পারে। তবে চলতি কথায় আমরা তাদেরই টেরাটোলজিস্ট বলি, যারা ম্যালফরমেশানস ইন প্ল্যাণ্ট অ্যাণ্ড অ্যানিমাল নিয়ে কাজকর্ম করে। সোজা কথায়, মানুষ কিংবা গাছপালার বেলায় দেখবে, কখনো-কখনো স্বাভাবিক চেহারার বদলে তারা অদ্ভুত অস্বাভাবিক এক চেহারা পায়। জন্ম থেকেই। যেমন ধরো, একটা বাচ্চা অ্যানিমাল—তার তিনটে কান, দেড়খানা নাক, কিংবা অন্য কোনো

অ্যাবনরম্যাল গ্রোথ রয়েছে, বা ধরো একটা ছাগলের বাচ্চার দুটো মাথা। এই সব অস্বাভাবিকতা নিয়ে যারা গবেষণা করে, তাদের বলে টেরাটোলজিস্ট। শুধু প্রাণীর বেলার নয়, গাছপালার ব্যাপারেও এটা চোখে পড়ে।”

মানেটা বোঝবার চেষ্টা করছিলাম। সুবীরদাও চুপ করে শুনছিল।

তালুকদার বললেন, “আমি ঠিক ওই জাতের টেরাটোলজিস্ট নই। আজকাল সব ব্যাপারেই ভাগাভাগি হয়ে গেছে জানো তো। যে ডাক্তার চোখ দেখে সে নাক দেখে না, যে তোমার পেটের অসুখ দেখবে সে কিন্তু মাথার গোলমাল দেখবে না”—বলে তালুকদার একটু হাসলেন, মজা করার হাসি। তারপর বললেন, “আমার ব্যাপারটা গাছপালা নিয়ে। কোনো-কোনো গাছপালা তার জাত আর ধাত বদলে ফেলে। যেমন ধরো একটা বেলগাছ যদি নিমগাছের মতন হয়ে যায়, কেমন লাগে! সেই রকম দেখা গেছে কোনো কোনো গাছ এমন একটা অস্বাভাবিক কাণ্ড করে ফেলে যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কখনো কখনো এদের মধ্যে জন্তু-জানোয়ারের মতন হিংস্রতাও দেখা যায়। অদ্ভুত ব্যাপার···অদ্ভুত···।”

আমি সুবীরদার দিকে তাকালাম। সুবীরদাও আমার দিকে তাকাল বোকার মতন, যেন বলল—কী বুঝছিস?

তালুকদার বললেন, “ব্যাপারটা তোমরা ঠিক বুঝবে না।”

“আপনি কি এই ব্যাপারে রিসার্চ করেন?”

“হাতে কলমে ঠিক নয়,” তালুকদার বললেন, “আমাদের সোসাইটির নাম হল, গ্লেডস বায়োলজিকাল অবজারভেশান সোসাইটি। সুইডেনে সোসাইটির খাস অফিস। এখন পর্যন্ত আমাদের এখানে তেমন কিছু কাজকর্ম হয়নি। আমরা মাত্র জনা অনেক আছি এখানে। বাঙালি আমি একলা।”

তালুকদার-সাহেবকে আমার বেশ অদ্ভুত লাগছিল।

আর খানিকটা পরেই গাড়ি খড়্গপুর পৌঁছে গেল।

ট্রেনে চাপলে সময় যেন কাটতে চায় না আমার। বিরক্তি লাগে।

এবার কিন্তু লাগছিল না। তালুকদার-সাহেব বাক্যবাগীশ নন, তবে নানা কথা বলতে পারেন। হাসি-তামাশাও জানেন। সুবীরদাও কথা বলছিল।

বিকেল ফুরিয়ে গিয়েছিল কখন। সন্ধে হয়ে এল।

ঝাড়গ্রাম স্টেশনে গাড়ি একটু বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় কোনো গণ্ডগোল দেখা দিয়েছিল এঞ্জিনে।

গাড়ি ছাড়ার পর আবার গল্পগুজব চলতে লাগল।

কথায় কথায় আমি তালুকদার-সাহেবকে জিজ্ঞেস করলাম, “আচ্ছা, আপনি কি সুবীরদার ব্যাপারটা শুনেছেন?”

মাথা হেলালেন তালুকদার। শুনেছেন।

“আপনার কী মনে হয়?”

“এখনও কিছু মনে হচ্ছে না। জায়গাটা আগে দেখি।”

“জায়গাটায় আর কি থাকতে পারে!” আমি বললাম, “নদী পাথর, বালি···আমিও অবশ্য দেখিনি।”

“গাছপালা!”

“গাছপালা?”

তালুকদার পকেট থেকে পাউচ বার করলেন, সিগারেটের পাতা। পাউচ থেকে তামাক বার করে হাতের তালুতে রাখলেন।

কিছু দেখাশোনা করে।

সুবীরদা এই বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে বেশ কিছুদিন বলতে গেলে সেই পুজোর পর থেকেই, কাজেই অব্যবস্থার কি ছিল না।

শোবার ঘর, বসার ঘর সবই গোছগাছ করা ছিল। চিঠি লে ছিল করালীকে, খাবার-দাবারও তৈরি ছিল আমাদের।

শোবার ঘরের একটা তালুকদার-সাহেবকে দেওয়া হল। অ ঘরটায় সুবীরদা আর আমি।

চা খেয়ে জামাকাপড় ছেড়ে নিলাম। হাত মুখ ধুয়ে সামা বিশ্রাম। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে যে যার শোবার ঘরে এসে বসলাম।

সুবীরদা আর আমি সিগারেট খেতে খেতে সাধারণ কথাবার্তা বলছিলাম। এই বাড়িটার কথাই বলছিল সুবীরদা। বাড়ির যি মালিক তিনি মারা গেছেন বছর দুই। সুবীরদার ভগ্নীপতির দা বাড়িটা কিনে নিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরে থাকেন ভদ্রলোক। নিজে এক-আধবার আসেন, বছরের বাকি সময়টা ফাঁকা পড়ে থাকে। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব বেশির ভাগ সময় এখানে এসে থেকে যায়। সুবীরদা আগেও এসেছে এ-বাড়িতে—বোন-ভগ্নীপতির সঙ্গে।

আমি বললাম, "তুমি তা হলে বাড়িটা এখনও নিয়ে রেখেছ?"

"নিয়ে রাখা আর কী! বলা আছে বিভূতিকে।" বিভূ সুবীরদার ভগ্নীপতির নাম।

সিগারেট শেষ করে আমি শুয়ে পড়লাম। কলকাতার বা শীতে মানুষ, এখানকার ঠাণ্ডা গায়ে লাগছিল বেশ।

সুবীরদা এখনও শোয়নি।

গায়ে মিলিটারি কম্বল চাপিয়ে আমি বললাম, "আচ্ছা, সুবীরদা, আমি একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না। তালুকদার-সাহেব ব্যাপারটাকে আরও যেন গুলিয়ে দিচ্ছেন! কী বলতে চান উনি?"

সুবীরদা তার খাটে মশারি টাঙাচ্ছিল। বলল, "আমারও তোর মতন গুলিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে পারছি না।"

"উনি বলছেন, মন্স্টার প্ল্যান্ট! মানেটা কী? আর সেই প্ল্যান্টের সঙ্গে সম্পর্কই বা কী তোমার ব্যাপারটার?"

চুপ করে থেকে সুবীরদা বলল, "তালুকদারই জানেন।"

"তবু, তোমার কিছু মনে হয় না?"

"আমার মনে হচ্ছে, উনি বলতে চাইছেন, এমন কোনো গাছ-গাছালি আছে যারা কোনো অঘটন ঘটিয়েছে।"

"তার মানে—তোমার বন্ধুদের গিলে খেয়েছে! মায় গাড়ি-টাকেও?" বলে আমি হেসে ফেললাম। "তালুকদার-সাহেবের মাথায় এটা কোথা থেকে এল? এ তো সেরেফ গাঁজাখুরি!"

সুবীরদার মশারি টাঙানো হয়ে গিয়েছিল। বাতি নেবাল। তারপর অন্ধকারে এসে শুয়ে পড়ল। সুবীরদার বিছানা হাত কয়েক দূরে। আমার এবং তার মশারির মধ্যে দিয়ে অন্ধকারে কিছুই দেখার কথা নয়, তবু আমি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলাম।

খানিকটা পরে সুবীরদা বলল, "মানুষ-খেকো গাছপালার কথা গল্পের বইয়ে আমি পড়েছি। তবে সে তো গল্প।"

"তা ছাড়া কী! পোকা-মাকড় কীট-পতঙ্গ গাছপালা খায়। খেতেও পারে। তা বলে মানুষ খাবে—এ হতেই পারে না। অসম্ভব! তাও তিন-তিনটে জ্যান্ত মানুষ, তার আগে একটা জীপ। এ বাবা রাক্ষসের কর্ম নয়। তা ছাড়া, ধরলাম—রাক্ষুসে কোনো

গাছ ওদের গিলে ফেলেছে। উত্তম কথা! কিন্তু তা যদি হয়, তোমার বন্ধু অনিল তা হলে আবার গাছের পেট থেকে বেরিয়ে এল কেমন করে? বলো?"

সুবীরদা কোনো জবাব দিল না। বলার কিছু নেই।

আমি বললাম, "তালুকদার-মশাই লোক ভাল, বুঝলে সুবীরদা। তবে তাঁর থিয়োরি অচল। অসম্ভব।"

"উনি এখন পর্যন্ত কোনো থিয়োরি দেননি," সুবীরদা বলল।

"তা ঠিক। তবে ওঁর থিয়োরি আমরা অনুমান করতে পারছি। এর বেশি উনি কী বলবেন?"

জবাব নেই সুবীরদার।

আমিও চুপচাপ।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। কোনো সাড়া নেই, শব্দ নেই। আমরা যে যার বিছানায় শুয়ে, যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

শেষে আমি বললাম, "এর চেয়ে আমার মেসোমশাইয়ের থিয়োরিটা অনেক বিশ্বাসযোগ্য। আমি বরং মানতে রাজি আছি গ্রহান্তরের কোনো জীবটিব এসে চিলের মতন ছোঁ মেরে তোমাদের নিয়ে গিয়েছিল! কিন্তু তালুকদার-সাহেবের মনস্টার প্ল্যান্ট থিয়োরি মানতে বাপু আমি রাজি নই।"

সুবীরদা মৃদু গলায় বলল, "কোনোটাই মানা যায় না, বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু যা ঘটেছে তার কোনো ব্যাখ্যাও তো পাচ্ছি না। আমি ভাই ব্যাখ্যাও চাই না। শুধু চাই ওরা ফিরে আসুক। ভগবান ওদের ফেরত দিলেই আমি খুশি। তবে অনিলের মতন যেন না হয়।"

আমার মনে হল, সুবীরদা যা বলেছে সেটাই ঠিক। যারা হারিয়েছে তাদের ফিরে পাওয়াই বড় কথা। ব্যাখ্যা নিয়ে কে মাথা ঘামাতে চায়! ব্যাখ্যা না পেলেও সুবীরদার চলে যাবে, কিন্তু তার বন্ধুরা, ড্রাইভার, ওরা যদি না আসে তবে সুবীরদা নিশ্চয় পাগল হয়ে যাবে একদিন। বেচারী সুবীরদা!

ঘুম পাচ্ছিল। কম্বলটা প্রায় নাক পর্যন্ত টেনে নিতে নিতে আমি বললাম, "সুবীরদা, আমার বিশ্বাস তুমি একটা ব্যাপার ভুল করছ আগাগোড়া।"

"কী?"

"তোমার বন্ধু অনিলকে সত্যিই তুমি দেখোনি।"

"কে বলল! আমি দেখেছি!"

"তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছ! তোমার এখন মাথার ঠিক নেই। তুমি পেছন থেকে অনিলের মতন কাউকে দেখেছ! ভেবেছ, অনিল। অনিল রেল-লাইনে কাটা পড়ার পর তুমি তার মুখও দেখোনি। তুমি বলছ, দেখার মতন অবস্থা ছিল না মুখের। তা হলে কেন তুমি বলছ, অনিলকে দেখেছ। ওটা তোমার দৃষ্টিবিভ্রম।"

সুবীরদা কথা বলল না প্রথমে, পরে চাপা গলায় বলল, "তাই মনে হয়।" বলে বড় করে নিশ্বাস ফেলল।

পরের দিন সকালে আমরা বাইরে বসে চা জলখাবার খাচ্ছিলাম। রাত্রে ঠিক বোঝা যায়নি, সকালে জায়গাটা বড় সুন্দর লাগছিল। সামনে পিচ বাঁধানো রাস্তা, ওই রাস্তা দিয়ে নাকি টাটানগর যাওয়া যায়। সামান্য দূরে একটা সাজানো-গোছানো ছোট পাহাড় আছে। ফুলডুংরি। রোদ উঠে গিয়েছিল অনেকক্ষণ। আকাশও যেন ঘুম ভেঙে উঠে চোখমুখ পরিষ্কার করে মাথার ওপর বসে আছে। পাখি-টাখি উড়ে যাচ্ছিল। বাড়ির বাগানে সামান্য কিছু শীতের

ফুল। একরাশ বড়-বড় গাঁদা ফুটে আছে একপাশে।

তালুকদারই প্রথমে উঠলেন, বললেন, "আর দেরি করে লা
নেই, চলো বেরিয়ে পড়া যাক।"

আমরাও মোটামুটি তৈরি ছিলাম।

সামান্য পরে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম। তালুকদার এক
ব্যাগ নিলেন—এয়ার-ব্যাগ। সুবীরদার কাঁধে ফ্লাস্ক, চা আর জলে
আমি ক্যামেরাটা গলায় ঝুলিয়ে নিলাম।

হেঁটে এলাম খানিকটা। রেল লাইনের ক্রসিং ছাড়াবার আগে
চোখে পড়ল, ঘাটশিলায় চেঞ্জারবাবু বড় কম আসেনি। স
বোধহয় কলকাতার লোক। সাজপোশাকে সেই রকম শৌ
দেখাচ্ছিল। বুড়োবুড়ি, ছেলেমেয়ে, সবরকম লোকই আছে।

স্টেশনের কাছাকাছি এসে রিকশা নেওয়া হল।

তালুকদার বললেন, "রিকশাগুলো আটকে রেখে লাভ হবে
সুবীর। ওদের বরং আমরা ছেড়ে দেব।"

আমাদের কেউ লক্ষ করল কিনা জানি না। যদি করেও থা
কলকাতার লোক বলেই ভেবেছে; ভেবেছে আমরা হাওয়া খে
এসেছি।

স্টেশনের পাশ দিয়ে সোজা রাস্তা। আমি লক্ষ করে দেখে
মফস্বলের কোনো ছোটখাট শহরই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়। বি
করে শহরের পুরনো রাস্তা। দু পাশে ছোটখাট দোকান, মামু
ঘরবাড়ি, নোংরা, ধুলো, এক-আধটা মন্দির-গোছের, কিছু ভা
রিকশা, একপাল কুকুর—এইসব।

রাস্তাটা আমার ভাল লাগছিল না। ধুলো আর ময়লার জ
আরও খারাপ লাগছিল বোধহয়।

পথ কম নয়। শেষে খানিকটা ফাঁকায় আসা গেল।

তালুকদার রিকশা থামিয়ে নামলেন। অমেরাও নেমে পড়লাম।

রিকশাঅলাদের তিনিই পয়সা মিটিয়ে দিলেন। বকশিস করলেন। তারপর ঘড়ি দেখে বললেন ঘণ্টা তিনেক পরে এখানে আবার ফিরে আসতে। দু তরফের ভাড়াই না হয় দেওয়া যাবে।

রিকশাঅলারা চলে গেল। তালুকদার-সাহেবের চেহারা, সাজ-পোশাক দেখে তাদের কী মনে হয়েছিল জানি না। হয়ত শাঁসালো মক্কেল ভেবেছিল।

আমরা তিনজনে হাঁটতে লাগলাম।

সুবীরদা হাত উঠিয়ে একটা দিক দেখাল। বলল, "রাজবাড়ি ওই দিকটায়।"

আমরা তাকালাম।

তালুকদার বললেন, "রাজবাড়ি পরে দেখা যাবে। আগে আসল জায়গায় চলো।"

রোদটা চমৎকার লাগছিল। এমন শীতে এই রোদ কেনই বা ভাল লাগবে না! ঘিঞ্জি নোংরা ভাবটাও আর নেই। রাস্তা চওড়া নয়, কিন্তু ভালই। আশেপাশে জনবসতি ফাঁকা হয়ে এসেছে। এক আধটা খোলার ঘর, ভাঙাচোরা চালা। তালুকদার-সাহেব চারদিকে তাকাতে তাকাতে পথ হাঁটছিলেন। হঠাৎ একটা সিগারেট চেয়ে বসলেন আমার কাছে। প্যাকেটের সিগারেট তিনি তেমন পছন্দ করেন না; তবু কী মনে করে চাইলেন।

আমি সিগারেট দিলাম। ধরিয়ে নিলেন তালুকদার। একটা বেয়াড়া লরি আসছিল। বোধহয় কাঠ-চালানের লরি। গাছের গুঁড়ি চাপানো রয়েছে।

লরিটা চলে যাবার পর তালুকদার বললেন, "এখানে কোনো গাড়িটাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না?"

সুবীরদা বলল, "না।"

"ধরলে-করলেও নয়?"

"দু-একজন কনট্রাকটার আছেন। তাঁদের বললে যদি দেন।"

"একবার চেষ্টা করে দেখো।"

আমি বললাম, "গাড়ি নিয়ে আপনি কী করবেন?"

"কেন! তুমি কি ভাবছ, একবার এসে চোখের দেখা দেখে গেলেই সব বুঝে যাবে! জায়গাটা ভাল করে দেখতে হলে বার কয়েক আসতে হবে, ভাই।"

আমাকে বোধহয় ঠাট্টাই করলেন তালুকদার।

আমরা হাঁটতে লাগলাম।

গাছপালা ঘন হয়ে আসছিল। বড় বড় গাছ। বট, নিম, অশ্বত্থ। আরও কিছু কিছু চোখে পড়ছিল যার নাম আমি জানি না। চিনিও না।

মিনিট পনেরো কুড়ি হাঁটলাম। রাস্তাটা যেন চড়াইয়ে উঠছে। এবার কিছুটা দূরে নদীর মতন দেখা যাচ্ছিল। অবশ্য নদী নয়।

আমি সুবীরদাকে জিজ্ঞেস করলাম, "ওই জায়গা?"

মাথা নাড়ল সুবীরদা।

তালুকদার কোনো কথা বলছিলেন না। অথচ চারদিকে তাঁর নজর রয়েছে। পকেট থেকে গগলস বার করে পরে নিলেন।

রোদ প্রখর। হাওয়া রয়েছে। জঙ্গলের দিক থেকে মাঝে মাঝে দমকা আসছিল বাতাসের। আশেপাশে লোকজন নেই। নির্জন, নিরিবিলি।

শেষে ব্রিজটা দেখা গেল। ওটাকে ঠিক ব্রিজ বলা যায় না, লম্বা কালভার্ট। পাশে লোহার রেলিং। নীচে একটা পাহাড়ি নদীর মতন। পাথরে পাথরে ভর্তি। চওড়া তেমন কিছু নয়। কিন্তু কালভার্ট থেকে অনেকটা নীচে সেই জলধারা।

তালুকদার আরও খানিকটা এগিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। বললেন, "আমরা কালভার্টটার ওপারে যাব, তাই না?"

"হ্যাঁ," সুবীরদা বলল, "আমরা আসবার সময় ঘটনাটা ঘটেছিল। ঠিক কালভার্টের মুখে।"

আমার মনে হল, কালভার্টটা বড্ড উঁচু আর তার রেলিং এতই নিচু আর পলকা যে, কোনো গাড়ি যদি কালভার্টের মুখে এসে কোনো কারণে রাস্তার পাশে চলে যায়—তবে তার পক্ষে বাঁচা অসম্ভব।

রুমালে মুখ মুছে তালুকদার হাঁটতে লাগলেন। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "সুবীর, তুমি নিজে গাড়ি চালাচ্ছিলে?"

"না, আমার ড্রাইভার।"

"তুমি নিজে একবারও চালাওনি?"

"আমি? সারা রাস্তায় বার দুই চালিয়েছি।"

"গাড়ি ঠিক ছিল? কোনো ডিফেক্ট?"

"খড়্গপুরে ব্রেক গণ্ডগোল করেছে। সারিয়ে নিয়েছিলাম।"

তালুকদার সুবীরদার দিকে তাকালেন একবার। কিছু বললেন না।

আমরা কালভার্টের ওপর দিয়ে হাঁটছিলাম। কত যে নিচু হবে জলের ধারাটা বুঝতে পারছিলাম না। চারতলা সমান হবে হয়ত—উঁচুতে আমরা হাঁটছি। নীচে শুধু পাথর আর পাথর। কোথাও কোথাও বালি। জল চোখে পড়ছে না।

কালভার্টের এপারে এলাম।

সুবীরদা বলল, “এইখানেই ঘটনাটা ঘটেছে।”

আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম।

তালুকদার গগলস খুললেন। কপাল, নাক, চোখ মুছলেন। তাকালেন চারপাশে।

আমার বড় অবাক লাগছিল। চারদিক শান্ত। আকাশ পরিষ্কার। রোদ যেন তার সমস্ত তাত দিয়ে জায়গাটা ভরে রেখেছে। নীচে পাথর, বালি। বেশ কিছু গাছপালা এপাশে। বড় বড় গাছ ছাড়াও ঝোপঝাড় অনেক রয়েছে।

এতক্ষণ একটানা রোদে হাঁটার পর গরম লাগছিল। ঘামও হচ্ছিল কপালে।

আমি বললাম, “এই জায়গাটা দেখে কে বিশ্বাস করবে সত্যিই এত বড় একটা অদ্ভুত ঘটনা এখানে ঘটে গেছে?”

তালুকদার বললেন, “তোমরা দাঁড়াও, আমি একবার নীচে যাব।”

কাঁধে ব্যাগ ঝুলিয়ে তালুকদার ধীরে ধীরে নামতে লাগলেন নীচে। পথের পাশে গাছের ছায়ায় আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

কয়েকটা পাখি উড়ে গেল চোখের সামনে দিয়ে। একটা গাড়ি আসছিল। কালভার্ট পার হয়ে চলে গেল। জঙ্গলের বাতাস এল দমকা।

সত্যি বলতে কী, আমার বিশ্বাস হচ্ছিল না এখানে কোনোদিনই কিছু ঘটেছে। হয়ত সবই সুবীরদার কল্পনা।

সিগারেট ধরিয়ে রাস্তার পাশে ছায়ায় বসলাম।

সুবীরদাও বসল। তার মুখেও সিগারেট।

তালুকদার নীচে নেমে গিয়েছেন। গাছগাছালির দিকে। আমরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলাম।

আমি বললাম, “সুবীরদা, এখানে একমাত্র গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট ছাড়া কিছু হতে পারে না।”

সুবীরদা আমার দিকে তাকাল। “গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। আমি হাজারবার বলছি, গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট হয়নি। অ্যাকসিডেন্ট হলে আমি বাঁচতাম না।”

“তা ঠিক। তবে, রাখে হরি মারে কে? মানুষ যেমন সহজে মরে—সেই রকম কত অদ্ভুত ভাবে বেঁচে যায়। হয়ত তুমি বেঁচে গেছ কোনোভাবে।”

সুবীরদা হঠাৎ বিরক্ত হয়ে উঠল। বলল, “বেশ, আমি কোনো-ভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম। কিন্তু সেই তিনটে দিন কোথায় ছিলাম? কোথায়? কেমন করে বেঁচে থাকলাম? কে আমায় বাঁচিয়ে রাখল?” বলতে বলতে সুবীরদার গলা যেন উত্তেজনায় কেমন কর্কশ হয়ে এল।

বাড়ি ফিরতে বেলা হয়ে গেল অনেকটা।

সকালের দিকে শীতের রোদে ঘুরে বেড়াতে আরাম লেগেছিল। কিন্তু ঘণ্টা তিনেক ওই রোদে ঘোরাফেরা করার পর আর তেমন আরাম লাগছিল না। বরং আমরা খানিকটা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রোদে-ধুলোয় চোখ-মুখ রুক্ষ হয়ে উঠেছিল। তালুকদারের নাকের ডগা রুমালের ঘষায় ঘষায় লাল, চোখ ছলছল করছে।

একটা কথা স্বীকার করতেই হবে, আমি আর সুবীরদা যেন নিতান্তই তালুকদার-সাহেবের সঙ্গী ছিলাম। ভদ্রলোক কিন্তু কম পরিশ্রম করেননি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অনেক কিছু দেখছিলেন। অবশ্য গাছপালা।

কালভার্টের গা বেয়ে নীচে পর্যন্ত গাছপালা কম ছিল না। বড়

গাছ দু-একটা, বাকি ছোট ছোট গাছ ; আর অজস্র ঝোপঝা
তালুকদার তাঁর ব্যাগ থেকে একটা জিনিস বার করলেন—যা দেখ
অনেকটা গুপ্তির মতন—তবে ছোট। দূরবীন গোছের কী একটা তাঁ
গলায় ঝুলছিল। সব চেয়ে যেটা অবাক ব্যাপার—তিনি খুব ছো
একটা যন্ত্র বার করলেন যা দেখতে অনেকটা পকেট ট্রানজিস্টা
মতন। কিন্তু সেটা ট্রানজিস্টার নয়। যন্ত্রটার একপাশে লম্বা একা
ছুঁচ, সেলাই মেশিনের ছুঁচের মতন লম্বা। বোতাম টিপলেই সে
একপাশে ওঠানামা করে। যন্ত্রটার গায়ে ছোট বড় দু-তিন রকমে
কাঁটা, দাগ। কী সব অঙ্কও লেখা রয়েছে।

মানুষের খেপামির শেষ থাকে না। তালুকদার যতই পরিশ্র
করুন, আমি কিছু তেমন দেখছিলাম না, যাকে আমার রাক্ষুসে গা
বলে মনে হল। একটা সাধারণ শিমুল, গোটা দুয়েক গাছ—যা
পাতা খানিকটা জাম গাছের মতন দেখতে—এই সব মামুলি গা
ছাড়া অন্য যা সবই তো ঝোপঝাড়।

আমার কোনো কাজ ছিল না। কয়েকটা ছবি তুললাম শুধু।

গাছপালার কাজ শেষ হলে আমরা কিছুক্ষণ পাথর-টাথর, বালি,
নালার মতন বয়ে-যাওয়া একটু জল—সবই দেখলাম। কোথাও কি
নেই। কোনো চিহ্নই নেই অত বড় ঘটনার।

বাড়ি ফেরার সময় তালুকদারকে হতাশ, ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।
কথাবার্তাও বলছিলেন না বেশি।

বাড়ির কাছাকাছি এসে একবার শুধু তালুকদার বললেন,
"সুবীর, একটা গাড়ি জোটাতে পারো না কোনোভাবে? একটু
সুবিধে হয়।"

সুবীরদা বলল, "দেখি। চেষ্টা করব।"

স্নান খাওয়া-দাওয়ার পর গা গড়িয়ে নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। দুজনেই। ঘুম ভাঙল যখন—তখন আর বিকেলের বিশেষ কিছু নেই, ফিকে রোদ শীত পড়ার আগেই যেন পালিয়ে যাচ্ছে।

হাই তুলতে তুলতে উঠে চোখ-মুখ ধুয়ে এসে শুনলাম, তালুকদার সাহেব শেষ দুপুরেই কোথায় বেরিয়ে গিয়েছেন। করালীকে বলে গেছেন, বিকেল নাগাদ ফিরবেন।

আমি সুবীরদাকে বললাম, "কোথায় গেলেন উনি বলো তো!"

"কী জানি! আবার কি সেই জায়গায় গেলেন?"

"তুমি আচ্ছা এক পাগল জুটিয়ে এনেছ!"

সুবীরদা ম্লান হাসল। বলল, "আমি নিজেই পাগল হয়ে যাচ্ছি। কী আর করব বল!"

আমরা চা খেয়ে বাইরে সামান্য পায়চারি করতে-না-করতেই আলো মরে গেল। মাথার ওপর পাতলা অন্ধকার, পাখি-টাখি উড়ে চলেছে, উত্তরের বাতাস শনশন করে উঠল, শীত আর অন্ধকার যেন আকাশ থেকে পা বাড়িয়ে রয়েছে, একটু পরেই নেমে পড়বে।

সুবীরদা বলল, "তুই কি বেরোবি?"

"একটু ঘোরাফেরা করা দরকার। যাই বলো, সকালের ধাক্কাতেই গা-গতর ব্যথা হয়ে গেছে।"

"তা হলে চল। রেল লাইনের ওপারে আমার জানাশোনা এক ভদ্রলোক আছেন। পবিত্রবাবু। তাঁকে গিয়ে ধরি। যদি একটা গাড়ি জোগাড় করে দেন। তালুকদার যখন বলছেন—"

"বেশ তো, চলো।"

ঘরে এসে আমরা জামা-টামা পালটে নিলাম।

করালী এসেছিল রাত্রের খাওয়া-দাওয়ার কথা জিজ্ঞেস করতে।

সুবীরদা তাকে বলল, "আমরা একটু বেরুচ্ছি। সন্ধের আগেই ফিরব। সাহেব এলে চা-টা দিয়ো।"

আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

ফিরে এসে দেখি, বাতি জ্বলছে তালুকদারের ঘরে। তিনি ফিরে এসেছেন।

সন্ধে হয়ে গিয়েছিল আগেই। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে।

তালুকদার তাঁর ঘরেই ছিলেন। পরনে পাজামা, গায়ে এক বিরাট জোব্বা, মাথায় উলের টুপি। বসে বসে সিগারেট খাচ্ছিলেন।

আমরা ফিরতেই বললেন, "এসো, কোথায় গিয়েছিলে?"

সুবীরদা বলল, "গাড়ি জোগাড় করতে ; আপনি বলেছিলেন।"

"পেয়েছ?"

"ব্যবস্থা হয়েছে। কাল সকালে লোক আসবে। কখন গাড়ি চাই বলে দিতে হবে তাঁকে।"

"ভেরি গুড।"

"আপনি দুপুরে কোথায় গিয়েছিলেন?"

তালুকদার নাক টানলেন। তাঁর সর্দি হয়েছে। গলাও ভারী। একটু চুপচাপ থেকে বললেন, "একটা পয়েন্ট আমার মনে পড়ল। আবার চলে গেলাম।"

"কোথায়? সেই কালভার্টের কাছে?"

মাথা হেলালেন তালুকদার।

আমার এখন সন্দেহ হল, মানুষটি নিশ্চয় পাগল। সকালে একদফা ঘুরে এসে আবার দুপুরে ছোটেন! দূর তো কিছু কম নয়।

তালুকদার বেতের গোল চেয়ারে বসে ছিলেন। বসতে বললেন ...মাদের।

সুবীরদা কাঠের চেয়ারে বসল। আমি বিছানায়।

সাধারণ কয়েকটা কথাবার্তার পর সুবীরদা বলল, "গাড়ি কাল ...খন লাগবে?"

"বিকেলে।"

"সকালে নয়?"

"না। সকালে নয়।"

"কোথায় যাবেন?"

"যাবার জায়গা একটাই। যেখানে গিয়েছিলাম আজ, সেখানেই ...াব।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, "আজ তো দু-দুবার গেলেন? ...কানো লাভ হল?"

মাথা নাড়লেন তালুকদার, "হল না।"

"তা হলে?" সুবীরদা বলল।

"আর একবার অন্তত যেতে চাই। সূর্য অস্ত যাবার পর, যখন ...আলো রোদ কিছুই থাকবে না।"

আমার কৌতূহল হচ্ছিল। বললাম, "কেন? আলো ছাড়া ...তে চান কেন? অন্ধকারে কি গাছপালা পালটে যায়?"

তালুকদার বললেন, "কোনো-কোনো গাছপালার সঙ্গে আলোর ...ম্পর্ক আছে বই কী! তুমি সূর্যমুখী ফুল দেখনি? স্থলপদ্ম ফুটতে ...দেখেছ? সকালে তার রঙ কেমন থাকে? দুপুরে কেমন হয়? ...সব তো সাধারণ কথা। অন্য ব্যাপারও আছে। ডক্টর জেকিল ...াও মিস্টার হাইডের গল্প জানো তো? সকালে সাদামাটা নিরীহ

মানুষ, রাত্রে দানব। ঠিক সেই রকম এক-আধটা গাছ চোখে পড়ে
রেয়ার গাছ, মোস্টলি সাউথ আমেরিকায়, আফ্রিকাতেও দেখা গে
যারা রাত্তিরে মিস্টার হাইডের মতন ব্যবহার করে। এরা এ
ধরনের ক্রিপার, লতানো গাছ। এই ধরনের গাছের নাম দে
হয়েছে 'নাইট মনস্টারস'।"

আমি অবাক চোখে সুবীরদার দিকে তাকালাম। সুবীর
আমার দিকে। তারপর দুজনেই তালুকদারের দিকে তাকি
থাকলাম। চোখের পাতা পড়ছিল না আমাদের।

করালী এসেছিল। চায়ের কথা জিজ্ঞেস করল।

তালুকদার চা আনতে বললেন।

আমি বললাম, "আপনি তো বলছেন, ওখানে কিছু খুঁজে পান
পেয়েছেন ?"

"পাইনি। পাব বলেও আশা করছি না। তবু একবার রাত্তি
দেখতে চাই।"

"সাউথ আমেরিকার গাছ ঘাটশিলায় কেমন করে আসবে ?"

"আমি কি তোমায় বলেছি শুধু সাউথ আমেরিকায় দেখা যা
আমি বলেছি ওদিকেই বেশি। আফ্রিকাতেও চোখে প
য়ুরোপেও দু-দশটা কাছাকাছি গাছ কারও কারও নজরে এসেছে।

"আমাদের দেশে সেই গাছ কেমন করে আসবে ?"

তালুকদার একটু হাসলেন, "সেটা ভগবান জানেন। আ
বলতে পারব না।...তবে কী জানো, জগদীশ—এই দেশে হিমাল
থেকে শুরু করে আসামের জঙ্গল, আর তোমার নীলগিরি পা
থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত কত রকমের গাছপালা আছে তার সঠিক হিসে
কেউ রাখে না। আমি কিন্তু তোমায় বলছি না—আমাদের দে

...ইট মনস্টারস আছে। আমি বলছি, থাকতেও পারে। কে
...তে পারে, নেই ?"

আমি যেন থতমত খেয়ে চুপ করে গেলাম।

সুবীরদা বলল, "আপনি কি কোনো লতানো গাছ দেখেছেন
...খানে ?"

মাথা দুলিয়ে তালুকদার বললেন, "লতানো গাছ ঝোপ-ঝাড়ে
...থায় না থাকে ? নীচে ফণিমনসার ঝোপ, তার পাশে বুনো
...তা। ঝোপ একেবারে ঢেকে ফেলেছে। আমার কিন্তু মনে হল
..., ওই বুনো লতার মধ্যে কিছু আছে। একেবারে নিরীহ লতা,
... যে-কোনো বন-জঙ্গলে দেখা যায়। তবে ঝোপঝাড় যেভাবে
...কে ফেলেছে লতায়, ভেতরের কিছু দেখা যায় না।"

আমি নিশ্বাস ফেলে বললুম, "ওটা তাহলে মনস্টার নয় ?"

"মনে হচ্ছে না মনস্টার। তবু একবার রাত্তিরে দেখতে চাই।"

আমরা সবাই চুপচাপ। যে যার মতন কল্পনা করছিলাম।
...ছিলাম। শেষে আমিই আবার তালুকদারকে জিজ্ঞেস করলাম,
...চ্ছা ধরুন যদি এমনই হয়—ওই বুনো লতা রাত্তিরে মনস্টার হয়ে
...ঠে, তাহলে আপনি কি মনে করেন—ওই রাক্ষুসে লতা সুবীরদার
...দের খেয়ে ফেলেছে ?"

আমার কথা বলার ঢঙ থেকেই বোঝা গেল, পুরো ব্যাপারটাকেই
...মি অবিশ্বাস্য, হাস্যকর মনে করছি। সত্যি বলতে কী আমি যেন
...র করেই অবিশ্বাসের ভান করলাম। আসলে আমার মাথারই
...মন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল।

তালুকদার বললেন, "হু টোল্ড ইউ দ্যাট ? আমি তো বলিনি
...স্টার ক্রিপার মানুষ খায় ! বলেছি ?"

আমরা হতভম্ব। মানুষ যদি না খায়—তবে সেই বুনো লতা দানব হোক, রাক্ষস হোক—কী যায় আসে আমাদের! ওই গাছ নিয়ে মাথা ঘামিয়েই বা কী লাভ! করালী চা নিয়ে এল। কাঠের ছোট ট্রে, বড় একটা টি-পট, তিনটে কাপ।

করালী চা ঢেলে দিল। আমরা যে যার চা নিলাম। চলে গেল করালী।

সুবীরদা বলল, "আমার বন্ধুদের সঙ্গে ওই গাছের কিসের সম্পর্ক তা হলে?"

তালুকদার চায়ে চুমুক দিলেন। তাকালেন সুবীরদার দিকে। বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। কিসের সম্পর্ক? সম্পর্কটা এমনিতে বোঝা যাবে না। তবে ধরো যদি এমন হয়, ওই ঝোপের অনেক তলায় তোমার বন্ধুরা মরে পড়ে আছে, আর তার ওপর রোজ কয়েক প্রস্থ করে ওই লতা ছড়িয়ে যাচ্ছে—তা হলে কেমন হয়?"

সুবীরদা কিছু বুঝল না। বোকার মতন বলল, "মানে?"

"মানে—মানে—ব্যাপারটা হল, মাটি কিংবা বালি খুঁড়ে কাউকে কবর দিলে যেমন হয় প্রায় সেই রকম।" তালুকদার সিগারেট পাকাতে পাকাতে বললেন, "ওই লতাগাছ তোমার বন্ধুটন্ধুদের এমন করে ঢেকে ফেলেছে যে বলতে পারো, ওই লতার তলায় তারা ডুবে গেছে।"

আমি সুবীরদার দিকে তাকালাম। তারপর তালুকদারের দিকে। বললাম, "সেটা কি সম্ভব?"

তালুকদার বললেন, "যদি এমন হয় ওই বুনো লতার মধ্যে মনস্টার ক্রিপারের ক্যারেকটার থাকে—তা হলে সেটাই সম্ভব। এটা অবশ্য খুবই অদ্ভুত, বিশ্বাস করা যায় না, কিন্তু ওই জাতের লতাগাছের চরিত্র হল—যে কোনো প্রাণী তার খপ্পরে পড়লে প্রতি ঘণ্টায় তার বাড় সাধারণ বাড়ের প্রায় তিরিশ চল্লিশ গুণ বেড়ে যায়। তার যতগুলো লিকলিকে ডালপালা আছে—দেখতে দেখতে বাড়তে থাকে, পাতাগুলোও বড় হয়ে যায়, আর শিকারটাকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে ক্রমেই সেটাকে একেবারে ঢেকে ফেলে। কিন্তু এরা প্রাণীখেকো নয়।"

সুবীরদা চা খাচ্ছিল। আমার দিকে তাকাল। আমিও চায়ে চুমুক দিলাম। আরাম লাগল।

সুবীরদাই কিছু বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই তালুকদার বললেন, "এই জাতের লতার নামে গল্পও আছে। গল্পটা আমার ঠিক মনে নেই, তবে মোটামুটি বলতে গেলে—একটি দেবশিশুকে বাঁচাবার জন্যে জলের ধারের শ্যাওলাকে দেবদেবীরা আদেশ করেছিলেন। দেবতাদের আশীর্বাদে সেই শ্যাওলা বিরাট লতার চেহারা নেয়, এবং বংশধরটিকে ঢেকে রাখে। দেবদেবীর কৃপায় সেই গাছ নাকি তখন থেকেই মায়াবী।" বলে তালুকদার হাসলেন। "দেবদেবীর কৃপা পেয়েই হোক আর না হোক—কিছু অদ্ভুত লতাপাতা গাছ কিন্তু পৃথিবীর কোনো আদিমকাল থেকে রয়ে গেছে। অনেক গাছ হারিয়ে গেছে, শেষ পর্যন্ত আর এই পৃথিবীতে টিঁকতে পারেনি। আবার কোনো গাছ স্বভাবচরিত্র পাল্টাতে-পাল্টাতে এখনও টিঁকে আছে। হয়ত দু-পাঁচ শো বছর পরে আর থাকবে না।"

চা নামিয়ে রেখে আমি বললাম, "আপনার ধারণা যদি সত্যি হয়, মানে ধরে নেওয়া যাক—আপনি যা বলছেন তাই ঘটেছে, তাহলে এবার আপনি বলুন—একমাত্র সুবীরদাকে ছেড়ে দিয়ে কেন এই রাক্ষুসে গাছ অন্যদের ঢেকে ফেলবে?"

তালুকদার সিগারেট ধরালেন। বললেন, "কথাটা ভেবেছি। এর একটি মাত্র জবাব হতে পারে। জীপ অ্যাকসিডেণ্টের পর যখন গাড়িটা গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছিল তখন সুবীর কোনোভাবে ছিটকে বেরিয়ে যায়। সে ওই ঝোপের মধ্যে পড়েনি। কাজেই বেঁচে গেছে।"

মাথা নাড়ল সুবীরদা। জোরে জোরে। বলল, "আমার কোনো অ্যাকসিডেণ্ট হয়নি। অ্যাকসিডেণ্ট হলে তিন দিন আমি কোথায় পড়ে থাকলাম?"

তালুকদার বললেন, "জানি না। হয়ত কাছাকাছি কোথাও অজ্ঞান হয়ে পড়ে ছিলে।"

সুবীরদা স্বীকার করল না।

আমি বললাম, "আমার একটা প্রশ্ন রয়েছে। যদি সুবীরদার বন্ধুদের ওই রকম দশাই হয়ে থাকে, তা হলে তারা কবেই মারা গেছে। কুকুর-বেড়াল মরে পড়ে থাকলে দুর্গন্ধ বেরোয়, আর দু-তিনটে মানুষ মরে পড়ে থাকলে পচা গন্ধ বেরুবে না?"

"রাইট," তালুকদার বললেন, "তুমি ঠিক বলেছ! ওটা বড় পয়েণ্ট। আমি ভেবেছি।" বলে উনি আবার একটু চা খেলেন, টান দিলেন সিগারেটে। সুবীরদার দিকে তাকিয়ে বললেন, "যদি আমরা ধরে নিই—সুবীরের বন্ধুদের ওই দশা—মানে যে-দশার কথা বলছি তা-ই হয়েছে—তবে আমার ধারণা, দিন দুই-তিনের পর থেকে পচা গন্ধ বেরুনো উচিত ছিল। আমি ধরে নিচ্ছি ডেড বডিগুলো এমনভাবে লতায়-পাতায় জড়ানো ছিল যাতে রোদ আলো তাপ খুব কম পেয়েছে, পচতেও দেরি হয়েছে। তবু দু-তিন দিন যথেষ্ট··· নয় কি?"

সুবীরদা অধৈর্য হয়ে বলল, "আমি তো আপনাকে বলেছি আমরা

লোক লাগিয়ে যথাসাধ্য খুঁজেছি ওখানে। কাউকে পাইনি। কিছু পাইনি। কোনো দুর্গন্ধই নাকে আসেনি।"

তালুকদার গলা পরিষ্কারের শব্দ করলেন। বললেন, "আমি জানি তুমি পাওনি। পেলে তখনই ব্যাপারটা ধরা পড়ত। কাজেই আমার সন্দেহ কিংবা ধারণা টিঁকছে না। তবে সেটাও টিঁকতে পারে, যদি জানা যায়, ওই রাক্ষুসে লতার নিজেরই এমন কোনো উগ্র গন্ধ আছে যাতে পচা জিনিসের গন্ধ চাপা পড়ে!"

"এ-রকম আছে নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি জানি না," তালুকদার মাথা নাড়লেন। "আমি কিছু জানি না। এরকম গাছপালা আমি জীবনে দেখিনি, শুধু আমাদের রিসার্চ রিপোর্টে পড়েছি। তবে একটা কথা আমি বলতে পারি, যদি এমন কোনো লতাপাতা এখানে থেকে থাকে, তাহলে এতদিনে তার যা গ্রোথ হয়েছে, সেই বিশাল জঙ্গল থেকে কাউকে খুঁজে বার করা বোধহয় সম্ভব নয়।"

সুবীরদা আমার দিকে অসহায়ের মতন তাকাল।

আমি তালুকদার-সাহেবের কথা বিশ্বাস করলাম না। এমন হতে পারে বলে মনে হল না আমার। কালভার্টের নীচে ঝোপ-জঙ্গল যথেষ্টই রয়েছে, তবে নিশ্চয় এমন ঘন ঝোপ-জঙ্গল নেই যা দু-তিনটে মানুষ এবং একটা গাড়িকে পুরোপুরি লুকিয়ে ফেলতে পারে।

চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল আমাদের। তিন জনেই চুপচাপ।

খানিকটা পরে আমি তালুকদারকে বললাম, "আচ্ছা, একটা কথা বলব?"

বলো।

"আমার এক মেসোমশাই একটা কথা বলছিলেন। মানে

অনুমান করছিলেন। তিনি বলছিলেন, অন্য কোনো গ্রহ থেকে কোনো জীবটিব এসে যদি ওইভাবে ছোঁ মেরে নিয়ে গিয়ে থাকে সুবীরদাদের? আপনি কি মনে করেন, এ-রকম কিছু হওয়া সম্ভব?"

আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন তালুকদার। তাঁর চোখের পাতা ফুলে রয়েছে সামান্য। ছলছল করছে চোখ। রুমালে নাক-চোখ মুছলেন।

উনি কোনো কথাই বলছিলেন না।

আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে ছিলাম।

অনেকক্ষণ পরে তালুকদার বললেন, "ও-ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। তোমার মেসোমশাই যা বলেছেন তা মানতে হলে আমার বিশ্বাস করতে হবে পৃথিবী ছাড়া অন্য কোনো গ্রহে জীব আর জীবন আছে। শুধু থাকলেই চলবে না, তারা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে বেশি না হোক কম উন্নত নয় বিজ্ঞানের দিক থেকে। আজ-কাল বিজ্ঞান বড় জটিল, ভীষণ জটিল হয়ে এসেছে। আরও হবে। পৃথিবীর বাইরের কোনো জীব এত উন্নতি করেছে কি না কে বলবে! তবে আমি নিজে ওটা বিশ্বাস করি না।"

আমরা চুপচাপ হয়ে পড়লাম আবার।

শেষে সুবীরদা উঠল। বলল, "কাল সন্ধেবেলায় তা হলে গাড়ি নেবেন?"

"নিশ্চয়। সবই যখন হল—ওটা আর বাকি থাকে কেন। একবার যাই, দেখে আসি। মনে হয় না কিছু পাব। তবু···।"

৮

পরের দিন সন্ধেবেলায় একটা জীপ গাড়ি পাওয়া গেল কিন্তু ড্রাইভারকে ধরা গেল না। সুবীরদা নিজেই গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এল বাড়িতে।

তালুকদার-সাহেব মোটামুটি তৈরি ছিলেন। তাঁর কাঁধে মামুলি ঝোলা, হাতে টর্চ। মাথায় নেপালি টুপি। বোধহয় ঠাণ্ডাটা আর লাগাতে চান না মাথায়। ওঁর শরীরও তেমন ভাল ছিল না। আমরা তো বারণই করেছিলাম, বলেছিলাম—থাক না আজ। উনি শুনলেন না।
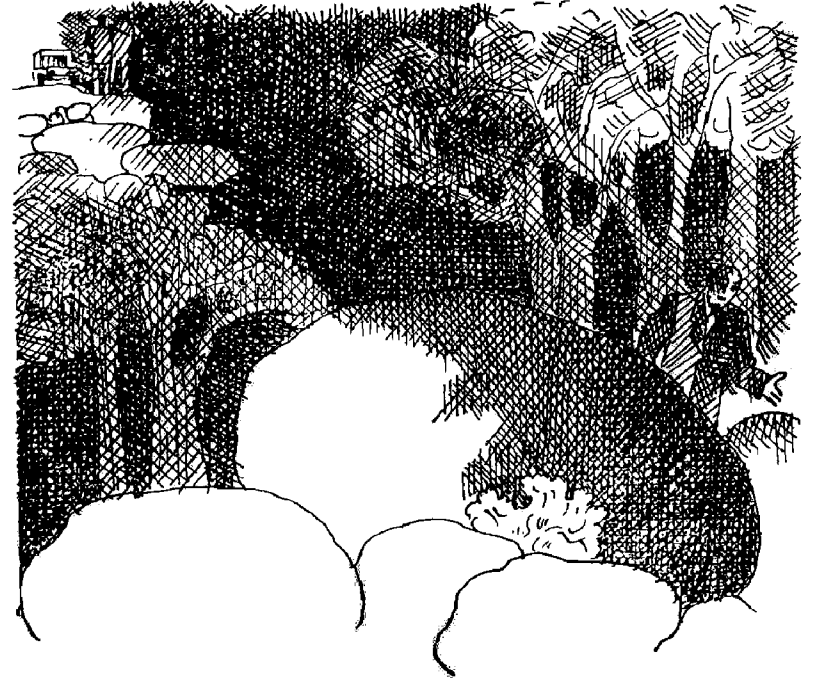
সন্ধের সামান্য পরেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

জীপ গাড়িটারও মাথার ক্যানভাস ছেঁড়াফাটা, বসার সীট কাঠের মতন শক্ত, ধুলোয় ময়লায় ভর্তি। কনট্রাকটারের জীপ বোধহয় এই রকমই হয়। কিংবা এমনও হতে পারে, নেহাতই যেন দায়ে পড়ে ভদ্রলোক গাড়িটা সুবীরদাকে দিয়েছেন।

গাড়িতে ওঠার সময় তালুকদার বললেন, "তেলটেল আছে তো? দেখে নিয়েছ?"

তেল আমরা আগেই নিয়েছিলাম।

গাড়ি চলতে শুধু করল। রাস্তায় লোকজন কম। শীতের দিনে কে আর অকারণে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবে! দোকান-টোকানে কিছু ভিড় অবশ্য রয়েছে। স্টেশনের কাছে মিষ্টির দোকানে রেডিয়ো বাজছিল। আলোটালো জ্বলছে।

স্টেশন ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে আসতেই আবার চুপচাপ ভাব, ছিটেফোঁটা আলো, সামান্য কিছু লোকজন।

তালুকদার-সাহেব যে অকারণে যাচ্ছেন তাতে আমার সন্দেহ ছিল না। তিনি নিজেই বলেছেন, এমন কোনো গাছপালা তাঁর নজরে পড়েনি যাতে মনে করা যায় কালভার্টের নীচে কোনো রাক্ষুসে গাছপালার অস্তিত্ব আছে। তবু তিনি ব্যাপারটা ছেড়ে দিতে চান না। আরও একটু দেখতে চান। কোথা থেকে এই 'নাইট মনস্টার' হাজির করেছেন, তারই খোঁজে চললেন এখন। ভদ্রলোক যে জেদি, একগুঁয়ে তাতে সন্দেহ নেই. কিন্তু বদ্ধ উন্মাদ। উন্মাদ না হলে মানুষের মাথায় এ-সব উদ্ভট জিনিস কেমন করে আসে!

তালুকদারের কথাবার্তা আমার বিশ্বাস হয়নি। বরং বিশ্বাস যদি করতেই হয়, সুকুমার মেসোমশাইয়ের কথা আমি বিশ্বাস করতে রাজী। গ্রহান্তরের জীবদের তবু হয়ত বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু নিরীহ গাছপালার এ-রকম আসুরিক কাণ্ডকারখানা বিশ্বাস করতে আমার রুচি হচ্ছিল না।

তালুকদার গলায় মাফলার বেশ ঘন করে জড়িয়ে নিয়ে বললেন, "সুবীর, তুমি বরং আমাকে দাও, আমি চালাই।"

সুবীরদা থতমত খেয়ে বলল, "কেন?"

"দাও না আমাকে। তুমি বোধহয় নার্ভাস হয়ে পড়ছ!"

"নার্ভাস?"

"তোমার হয়ত সেদিনের কথাই মনে পড়ছে বেশি। মন অস্থির হয়ে পড়ছে। আমায় দাও। আমি খুব একটা খারাপ গাড়ি চালাই না।"

সুবীরদা গাড়ি থামাল!

আমরা পাশাপাশি তিনজনে বসে ছিলাম। সুবীরদা, তালুকদার, আমি। গাড়ি থামিয়ে সুবীরদা নীচে নামল। তালুকদার সরে গেলেন ড্রাইভারের সীটে। সুবীরদা ঘুরে এসে আমার পাশে বসল। আমি তালুকদারের দিকে সরে গেলাম।

আগে আমি কিছু বুঝতে পারিনি। সুবীরদা আমার পাশে এসে বসার পর তার চোখমুখ দেখে আমার মনে হল, সত্যিই সুবীরদাকে কেমন নার্ভাস দেখাচ্ছে।

তালুকদার গাড়ি চালাতে লাগলেন।

সুবীরদা হঠাৎ একটা সিগারেট চাইল আমার কাছে।

গাড়ি চালাতে চালাতে তালুকদার বললেন, "তুমি না বলছিলে সুবীর, সেদিন রাস্তায় তোমরা ঝড় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে এসেছিলে?"

"হ্যাঁ। তবে গিধনির পর আর বৃষ্টি পাইনি।"

"আকাশে মেঘ ছিল ?"

"তা ছিল।"

"রাস্তাও নিশ্চয় ভিজে ছিল ?"

"এদিকেও তো ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল।"

"জোরে আসছিল ?"

"না।"

সামান্য চুপ করে থেকে তালুকদার বললেন, "কালভার্টের মুখে যেখানে তোমাদের গাড়ি থেমে গিয়েছিল বলছ, সেখানে একটা বাঁক আছে। মানে একটা কার্ভ শেষ হয়েছে ওই মুখটায়। তোমাদের গাড়ি ভিজে রাস্তায়, কার্ভের ওই পয়েন্টটায় যদি স্কিড করে—সাংঘাতিক একটা অ্যাকসিডেন্ট হওয়া সম্ভব।"

সুবীরদা অসন্তুষ্ট হল। বলল, "অ্যাকসিডেন্ট হয়নি।"

তালুকদার চুপ করে গেলেন।

আমরা অনেক দূর চলে এসেছিলাম। আর কোথাও জনবসতি নেই। একেবারে নির্জন। এক ফোঁটা আলোও চোখে পড়ছে না। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। দু' পাশের গাছপালা যেন আমাদের গায়ে এসে পড়ছে। দিনের বেলায় এই জায়গাটা যেমন দেখাচ্ছিল এখন আর সেরকম দেখাচ্ছে না। এখন বড় নির্জন, স্তব্ধ, ছমছমে দেখাচ্ছিল। গাড়ির হেড্‌লাইট যদি জ্বালা না থাকত, আমি অন্তত এই অন্ধকারে ভয় পেয়ে যেতাম।

আর একটু পরেই সেই কালভার্ট।

তালুকদার গাড়ির গতি একেবারে কমিয়ে দিলেন। ধীরে ধীরে, প্রায় গড়াতে গড়াতে গাড়িটা এপারে এল। এপারে এসে থামল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তালুকদার বাতি নিবিয়ে দিলেন। সমস্ত বাতি।

সঙ্গে-সঙ্গে যেন চারদিক থেকে অন্ধকার ছুটে এল, বন্যার জলের মতন, আমাদের ডুবিয়ে দিল। চারপাশে কী আছে না আছে চোখে পড়ে না ; শুধু কালো আর কালো।

চোখ একটু সয়ে গেল। আমরা রাস্তায়। গাড়ির মধ্যে বসে। সামনে, পেছনে, পাশে থমথম করছে অন্ধকার। বাতাস দিচ্ছে শনশন করে। শীত।

তালুকদার নামলেন।

আমার যে কী হল, হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। মনে হল, কিছুদিন আগে এখানে যা ঘটেছে, আবার যদি সেই রকম ঘটে! ঘটতেও তো পারে। সবই সেই রকম। সেই জীপ গাড়ি, সেই কালভার্টের মুখের জায়গাটা, আর আমরা তিনজন। যদি এই অবস্থায় আমি আর তালুকদার হারিয়ে যাই, যদি সুবীরদাও হারিয়ে যায়! তবে ?

গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। হাত-পা কাঁপল।

সুবীরদাও দেখলাম খুব অস্থির হয়ে উঠেছে।

তালুকদার কিন্তু রাস্তায় দাঁড়িয়ে।

আমি বললাম, "গাড়ির বাতিটা জ্বেলে রাখলে হয় না ?"

তালুকদার বললেন, "না। বাতি জ্বালবে না।···তোমরা গাড়িতে বসে থাকতে পারো। আমি একবার নীচেটা ঘুরে আসব।"

ভদ্রলোক বলেন কী! এই অন্ধকারে গাছপালা পাথরের মধ্যে দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে নীচে নামবেন! যদি পা হড়কে পড়েন তবে তো মরবেন।

আমি বললাম, "নামবেন কেমন করে ?"

তালুকদার বললেন, "পারব। দু-চারবার ওঠানামা করেছি তো।

রাস্তা দেখে রেখেছি।”

আমার ভয় হচ্ছিল। এভাবে কালভার্টের পাশ দিয়ে ঝোপঝাড় গাছপালা পাথর ডিঙিয়ে নামা ওঁর উচিত নয়। আমি আবার বললাম, “এই অন্ধকারে নামবেন?”

তালুকদার কথা শুনলেন না। নামার জন্যে এগিয়ে গেলেন। টর্চ জ্বাললেন। বললেন, “আমি টর্চ জ্বেলেই নামছি। তোমরা কিন্তু বাতিটাতি জ্বেলো না।” একটু থেমে আবার বললেন শান্তভাবেই, “আলো ছাড়া নামার উপায় নেই, আলো আমায় জ্বালতেই হচ্ছে। তবে আমার মনে হয়, অন্ধকার থাকলেই ভাল হত। আমি জানি না, টর্চের আলোতেও ওরা রিঅ্যাক্ট করবে কিনা।”

সুবীরদা রাস্তায় নেমে পড়ল, আমিও নামলাম। একজন এতটা ঝুঁকি নিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছেন, আমরা কেমন করে বসে থাকি!

সুবীরদা বলল, “আপনি এত রিস্ক নিচ্ছেন কেন! যদি কিছুই না দেখতে পান—”

“তোমরা ভেবো না। একবার ঘুরে আসি,” তালুকদার বললেন, “না পেলে না পাব—তবু একবার যাই।”

কথা শোনার মানুষ তালুকদার নন। তিনি রাস্তার পাশ দিয়ে নামতে লাগলেন ধীরে ধীরে।

আমরা দুজন রাস্তায়। মাথার ওপর ঝাপসা নক্ষত্র। বোধহয় হিম-কুয়াশার জন্যে ঝাপসা দেখাচ্ছিল। আমাদের চতুর্দিকে শুধু অন্ধকার আর অন্ধকার, আর গাছপালা। বুনো গন্ধ বাতাসে। শীতের হাওয়ায় গা হাত কাঁপছিল। আমার মাফলার ছিল সঙ্গে। কান মাথা জড়িয়ে নিলাম।

তালুকদার নেমে যাচ্ছেন। তাঁর হাতের টর্চের আলো কখনও

সামনে কখনও দূরে ছড়িয়ে পড়ছিল।

সিগারেটের প্যাকেট বার করলাম। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সুবীরদাকে সিগারেট দিলাম। “নাও, গরম হয়ে নাও।”

সিগারেট ধরানো হয়ে গেল।

“তোমার তালুকদার কিন্তু ম্যাড—” আমি বললাম, “আজকের এই দুর্ভোগ কিন্তু ওঁর জন্যে।”

সুবীরদা বলল, “কী করব! উনি কথাই শুনলেন না।”

“আমার তো ভয়ই করছে। একবার যদি পা পিছলে পড়েন—”

তালুকদারকে দেখা যাচ্ছে না, তাঁর টর্চের আলো নীচে নেমে যাচ্ছিল। এঁকেবেঁকে তিনি নামছেন। মাঝে-মাঝে আলো আড়াল পড়ে যাচ্ছিল। নীচে জোনাকি উড়ছে।

আমরা তখনও নীচে। বাতাসের শব্দ ছাড়া কোনো শব্দ নেই। এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে ভয়ই হয়।

“সুবীরদা?”

“বল।”

“তুমি তালুকদারের কথা বিশ্বাস করো?”

“না। করি না। কিন্তু আমার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কিছু নেই আর। সবই বিশ্বাস্য আবার কোনোটাই বিশ্বাস করা যায় না।”

কথা বললাম না। সত্যি, সুবীরদার বেলায় যা ঘটেছে তা কি বিশ্বাস্য? তবে?

ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকা যাচ্ছিল না। নাক গাল মুখ কনকনে ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছিল। আমি নীচের দিকে সরে এলাম।

আর ভাল লাগছিল না। এখানে এইভাবে আসা, দাঁড়িয়ে থাকা অর্থহীন। কোনো মানে নেই এই নির্বোধের মতন অভিযানের।

কতক্ষণ সময় যে কেটে গেল জানি না, হঠাৎ সুবীরদা বলল "জগু, তুই আলো দেখতে পাচ্ছিস নাকি ? আমি দেখতে পাচ্ছি না।"

নীচের দিকে তাকালাম। তালুকদারের টর্চের আলো দেখা যাচ্ছে না। তাকিয়ে থাকলাম। জোনাকির আলো ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। কোথায় তালুকদার ? বুকের মধ্যে ধক করে উঠল। পড়ে-টড়ে গেলেন নাকি পা পিছলে ? তা হলে তো গড়িয়ে-গড়িয়ে কোথায় চলে যাবেন কে জানে !

"আমিও তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না, সুবীরদা ?"

"গেলেন কোথায় ?"

"পড়ে যাননি তো ?"

"আমরা তো টর্চও আনিনি।"

"গাড়ির বাতিটা জ্বালবে ? হেডলাইট ?"

"গাড়িটাকে তা হলে হয় পিছিয়ে কালভার্টের মাঝখানে নিয়ে যেতে হবে, না হয় মুখ ঘুরিয়ে নিতে হয়। কিন্তু হেডলাইটের আলো তো সোজা হয়ে পড়বে! অত নিচুতে কেমন করে পৌঁছবে !"

কথাটা ঠিক। আলো জ্বাললে কিছুটা ছড়িয়ে পড়বে ঠিকই কিন্তু অত নীচে নামবে না। তা ছাড়া তালুকদার আলো জ্বালতে বারণও করেছেন। তা হলে কি তিনি নিজেও টর্চের আলো নিবিয়ে কোনো রাক্ষুসে লতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন ?

কথাটা মনে হতেই আমার গা শিউরে উঠল।

"সুবীরদা, তালুকদার কি নাইট মনস্টার দেখতে পেলেন ?"

সুবীরদা কেমন যেন শব্দ করে উঠল, আঁতকে ওঠার। "সর্বনাশ ! তা হলে—তা হলে তো ওঁকেই ওই গাছ শেষ করে ফেলবে !"

আমি আরও ভয় পেয়ে গেলাম। কী সর্বনাশ ! সত্যিই কি তালুকদার সেই রাক্ষুসে লতা দেখতে পেয়েছেন ! নাকি তিনি দেখবার বোঝবার আগেই দানব-গাছ তাঁকে জড়িয়ে ধরেছে ! হয়ত শিকারীর মতন ওত পেতে বসে ছিল গাছটা, খুব সহজেই তালুকদারকে ধরে ফেলেছে।

ভয় মানুষকে দিশেহারা করে ফেলে। আমরা এমনই দিশেহারা বোধ করলাম যে, সমস্ত কিছু ভুলে গিয়ে চেঁচাতে লাগলাম, চিৎকার করে ডাকতে লাগলাম তালুকদারকে। ভয়ে গলা উঠছিল না, ভাঙা শোনাচ্ছিল। তার ওপর জঙ্গলের শনশনে বাতাস এসে আমাদের গলার স্বর কোথায় যে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল কে জানে !

এ বড় অদ্ভুত অবস্থা। চারদিকে গাছপালা বনজঙ্গল, মাথার ওপর আকাশ, ঘুটঘুট করছে অন্ধকার, আমরা নিঃসাড় এক জগতের মধ্যে যেন বন্দী হয়ে গিয়েছি। আমাদের করার কিছু ছিল না; কিংবা যা ছিল সবই ভুলে গিয়ে শুধু পাগলের মতন তালুকদারকে ডাকতে লাগলাম।

কোথাও কোনো সাড়া নেই। জোনাকির আলো ছাড়া এক ফোঁটা আলোও নেই।

সুবীরদা কেঁদে ফেলল।

আমার মনে হল, তালুকদারও বুঝি হারিয়ে গেলেন, আর তাঁকে আমরা খুঁজে পাব না। হঠাৎ সুবীরদার কী মাথায় এল, কয়েক পা ছুটে গিয়ে জীপের হর্ন বাজাতে লাগল। একটানা। আমি পাথরের মতন দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আচমকা, একেবারে আচমকা—নীচে থেকে আলোর সাড়া এল, আলোটা জ্বলল, ওপরে এসে কালভার্টের গায়ে পড়ল।

সুবীরদা হাত উঠিয়ে নিল হর্ন থেকে।

আমার বুক তখনও কাঁপছে, হাত-পা ঠাণ্ডা। তবু নিশ্বাস ফেলতে পারলাম স্বস্তির। তালুকদার বেঁচে আছেন।

সুবীরদা যেন মাইলখানেক পথ ছুটে এসেছে—হাঁপাতে লাগল, নিশ্বাস নিচ্ছিল শব্দ করে।

তালুকদার উঠে আসছেন। তাঁর টর্চের আলো চোখে পড়ছিল আমাদের।

আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকলাম।

সময় যেন আর কাটতে চায় না। তালুকদারকে যেন একবার দেখতে পেলে বেঁচে যাই। তালুকদার প্রায় উঠে এসেছেন, আর সামান্য মাত্র, হঠাৎ গাড়ির শব্দ পাওয়া গেল। চমকে উঠে আমরা আমাদের জীপের দিকে তাকালাম। রাস্তার একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। শব্দটা তা হলে কোথায়?

মনে হল কোনো গাড়ি উলটো দিক থেকে এগিয়ে আসছে। সোজা এসে আমাদের গাড়ির মুখোমুখি ধাক্কা লেগে যেতে পারে। অবশ্য লাগবে না। তালুকদার আমাদের জীপটাকে যতটা পারেন রাস্তার পাশ করে রেখেছেন।

খুবই আশ্চর্য। একটা গাড়ি আসছে অথচ তার কোনো আলো নেই। এই অন্ধকারে কেমন করে আসছে গাড়িটা?

তালুকদার ততক্ষণে উঠে এসেছেন।

"তোমরা এত চেঁচামেচি করছিলে কেন?" তালুকদার বললেন।

সুবীরদা সে-কথার কোনো জবাব দিল না, বলল, "শব্দটা শুনতে পাচ্ছেন?"

তালুকদার কান পাতলেন। "গাড়ির শব্দ।"

"কোথায়? কোন দিক থেকে আসছে?"

তালুকদার টর্চের আলো দিয়ে উলটো দিকটা দেখালেন, আমরাও ওই দিকটার কথা ভেবেছিলাম।

আমি বললাম, "গাড়িটা কেমন করে আসছে? এই অন্ধকারে? আলো কই?"

তালুকদার বললেন, "বোধহয় আলো খারাপ হয়ে গেছে।"

সুবীরদা বলল, "হতে পারে। তাই ধীরে-ধীরে আসছে।"

গাড়িটা যেন আরও কাছে এগিয়ে এল। শব্দ স্পষ্ট।

সুবীরদা বলল, "জীপ! শব্দ শুনে মনে হচ্ছে।"

বাঁকের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা।

তালুকদার আলো ফেললেন টর্চের।

একটা জীপ গাড়ি ক্রমে কাছে এল। হর্ন দিল। তারপর আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে সোজা কালভার্টে উঠে গেল।

সুবীরদা হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল। "আমার জীপ।"

কথাটা আমার কানে গেলেও ভাল করে বুঝতে পারলাম না। "তোমার জীপ মানে?"

"আমার গাড়ি! অবিকল আমার গাড়ির হর্ন।"

তালুকদার বললেন, "কী বলছ তুমি?"

সুবীরদা তালুকদারের হাত চেপে ধরল। "আমার ভুল হতে পারে না। আমি বলছি, আমার জীপ। সেই এঞ্জিনের শব্দ, সেই হর্ন।"

আমি হতভম্ব। সুবীরদার জীপ আজ এতদিন পরে এভাবে কেন আসবে? কে নিয়ে আসবে?

সুবীরদা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। বলল, "আমার গাড়ি আমি চিনি। ও গাড়ি আমার ছাড়া কারুর নয়।"

তালুকদার বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন। বললেন, "তা হলে

দেরি করে লাভ নেই। চলো, গাড়িটাকে ফলো করি।"

আমরা তিনজনে গাড়িতে এসে উঠলাম। তালুকদারই স্টিয়ারিং ধরলেন। গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে আমরা আবার ঘাটশিলার দিকে ফিরতে লাগলাম। হেডলাইট জ্বলছিল।

তালুকদার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই বললাম, "আপনি কিছু পেলেন নীচে?"

"না।"

"তা হলে?"

"কিছুই না। আমার যেটুকু সন্দেহ ছিল তা ভুল।"

সুবীরদা বলল, তার গলা কাঁপছিল, "কিন্তু আমার জীপটা এতদিন পরে কেমন করে ফিরে এল?"

তালুকদার কোনো জবাব দিলেন না।

আমি বললাম, "গাড়িতে লোক ছিল দেখেছি।"

তালুকদার বললেন, "আমিও দেখেছি। গাড়িটা যখন পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছিল টর্চের আলো ফেলেছিলাম। লোক ছিল।"

সুবীরদা থরথর করে কাঁপছিল। "ক'জন দেখেছেন?"

ঠিক লক্ষ করতে পারিনি।"

আমার হাত চেপে ধরল সুবীরদা, হাতের তালু বরফের মতন ঠাণ্ডা। "তুই ক'জনকে দেখেছিস?"

আমিও তেমন করে লক্ষ করিনি। তবে লোক ছিল। বললাম, "পেছনে তো দুজন ছিলই।"

সুবীরদা আমার হাত প্রাণপণে চেপে ধরল।

তালুকদার একটু জোরেই গাড়ি চালাচ্ছিলেন। সামনের গাড়িটাকে ধরতে চান।

অন্যমনস্কভাবে তালুকদার বললেন, "আমি কিছুই বুঝতে পারছি না, সুবীর। যদি বিশ্বাস করে নিতে হয়, কোনো অদ্ভুত কারণে, কী কারণ আমি জানি না, তোমার গাড়ি, তোমার বন্ধু-বান্ধব—সেদিন হঠাৎ যদি অন্য কোনো ডাইমেনশানে চলে গিয়ে থাকে—তবেই এই আশ্চর্য অদ্ভুত জিনিস হয়ত সম্ভব।"

"অন্য ডাইমেনশান—?" আমি অবাক হয়ে বললাম।

তালুকদার বললেন, "ব্যাপারটা আমি বুঝি না। তবে ফোর্থ ডাইমেনশান নিয়ে আজকাল আকছার কথাবার্তা হয়।" বলে নিজের মনেই বিড়বিড় করলেন, "ভগবান জানেন, কেন কেমন করে ও-সব হাতে পারে..."

আমি বললাম, "আপনি কি বলতে চান, সেই ডাইমেনশান থেকে আবার লোকজন, গাড়ি ফিরে এসেছে?"

"জানি না। হতে পারে।"

"কেমন করে সম্ভব! গাড়িটা ছিল কোথায়, লোকজনরা বেঁচেই বা থাকবে কেমন করে?"

"আমায় জিজ্ঞেস করো না। আমি কিছু জানি না। বোধহয় কেউই এই প্রশ্নের জবাব দিতে পারবে না।"

সুবীরদা যেন বেহুঁশ হয়ে বসে ছিল। বলল, "আমি কোনো জবাব চাই না, কিছু জানতে চাই না। শুধু অনিল, মৃগাঙ্ক আর কপিলকে ফেরত চাই।"

তালুকদার গাড়ি আরও জোর করলেন। বললেন, "চলো দেখি, পেতেও পারো। ওরা হয়ত একই বাড়িতে যাচ্ছে।"

"কেমন করে যাবে?"

"কেন? যে-সময়টা এর মধ্যে চলে গেছে সেটা আমাদের কাছে

বাস্তব। ওদের কাছে বোধহয় নয়।”

আমার মাথায় কিছুই ঢুকছিল না। এ-সবই যেন ভৌতিক।

সুবীরদাই হঠাৎ বলল, “ওরা তো বাড়ি চেনে না। অনিল নয়, মৃগাঙ্ক নয়। কপিলও জানে না। বাড়ি শুধু আমিই চিনতাম। আমাকে বাদ দিয়ে ওরা কেমন করে বাড়ি ফিরবে?”

তালুকদার চুপ।

আমি ব্যাকুল হয়ে থাকলাম। তালুকদার কিছু একটা বলুন।

কী যে হল বুঝলাম না, তালুকদার হঠাৎ গাড়িটাকে যেন লাফ মেরে এগিয়ে দিলেন। হাওয়ার মতন ছুটতে লাগল গাড়ি।

তালুকদার বললেন, “ওই গাড়ি যদি ফিরে এসে থাকে, তা হলে তোমার বন্ধু অনিল, মৃগাঙ্ক, তোমার ড্রাইভার কপিল সকলেই ফিরে এসেছে। এমন কী, আমি আর আশ্চর্য হব না যদি...” বলতে বলতে থেমে গেলেন তালুকদার।

আমি বুঝতে পারলাম তালুকদার কী বলতে চান। তিনি হয়ত বলতে চান, সুবীরদাও আবার ফিরে এসেছে।

আমার মাথা গোলমাল হয়ে গেল। এ কখনো হয় না, হওয়া সম্ভব নয়। আমার পাশে যে সুবীরদা বসে আছে তার সবটাই আসল আমি জানি। অন্য কোনো সুবীরদা আসতে পারে না। অসম্ভব।

সুবীরদার বন্ধুরা ফিরে আসুক। অনিল, মৃগাঙ্ক, কপিল—সবাই আসুক। কিন্তু অন্য সুবীরদা যেন না আসে।

আমার কিছু করার ছিল না, উত্তেজনায় ভয়ে সমস্ত শরীর কাঁপছিল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলুম—সামনের গাড়িটাকে যেন আমরা রাস্তার মধ্যে ধরে ফেলতে পারি।

—